আসরের বিচার

গীতিকণ্ঠ মজুমদার

অণিমা প্রকাশনী
১৪১ কেশবচন্দ্র সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রকাশক ঃ
শ্রীদ্বিজদাস কর, অণিমা প্রকাশনী
১৪১ কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট, কলি-৯

অণিমা সংস্করণ ঃ ৬ই অক্টোবর ১৯৬৩

প্রচ্ছদ শিল্পী ঃ শ্রীদীনেশ শাসমল

মুদ্রাকর ঃ
শ্রীদ্বিজদাস কর, শ্রীধর প্রিণ্টার্স
১৪১ কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট, কলি-৯

অসংখ্য পাঠক-পাঠিকাদের

উদ্দেশ্যে

অশান্তি আর স্বার্থে ভরা পৃথিবীর নগর জীবন কত সুখের তা জানি না ; কিন্তু সেখানকার সৌখিনতা বড়ই চমৎকার। যা আজ পল্লীকেও ডাক দিচ্ছে।

সেই নগর জীবনের কথা নয়, আঁকব ব্যথাভরা পল্লীর রূপ।

মানুষের জীবনের নানা সমস্যা নিয়ে আলোচনার ঝড় ওঠে বিক্রমপুর বটতলার আসরে। অধিকাংশ মানুষই আসে এই আসরে সন্ধ্যার পর। একটি ছোটো মুদিখানার উঠোনে এই আসর বসে। গ্রামের মানুষরা এই উঠোনের চালা তৈরী করে দিয়েছে খড় দিয়ে। কিন্তু কোন প্রাচীর নেই—আছে কয়েকটি খুঁটি। গ্রামের এক প্রান্তে বেশ মনোরম জায়গা।

এই আসর জমানোর দায়িত্ব সাধারণতঃ গ্রহণ করে থাকে ত্রিভঙ্গ সরকার। বয়স ষাটের উপর। বয়স বেশী হলেও বেশ হৃষ্টপুষ্ট। মাথার চুল সাদা কালোয় মেশানো। চৈতনটা ধার্মিকতার লক্ষণ হলেও সংসার জীবনে অনেক দুষ্ট কর্মের সঙ্গে তার পরিচয় আছে। বর্তমানে তার পরিবর্তন বড়ই চমৎকার। 'রামায়ণ' 'মহাভারত' তার নিত্য সঙ্গী। তাই এখন সে গ্রামের মানুষদের কাছ হতে অনেক শ্রদ্ধা, সম্মান কুড়োচ্ছে। সন্ধ্যার সময় তার 'রামায়ণ' পাঠ বড়ই চমৎকার পরিবেশ সৃষ্টি করে।

সন্ধ্যার পর প্রত্যহ কি বর্ষা কি গ্রীষ্ম ত্রিভঙ্গ সরকার কাশতে কাশতে ঐ উঠোনে উপস্থিত হয়। তার চিরপরিচিত চাটাই পেতে শুরু করে 'রামায়ণ' পাঠ।

বহুদিন থেকে এই আসর বসে আসছে। 'রামায়ণ' পাঠই আসরের আলোচ্য বিষয় নয়। বহু আলোচনার, বহু সমস্যা সমাধানের আলোচনা

ক্ষেত্র। অবশ্য 'পদ্মপুরাণ' পাঠও হয় মাঝে মধ্যে। ঐ পাঠের মধ্য দিয়ে নানা তর্কের সৃষ্টি হয় এবং সেই তর্কের মধ্য দিয়ে আসর হয় গরম।

সেদিনকার একটা কথা মনে পড়ে। অভয় দাস একটা প্রশ্ন তোলে— সীতা প্রকৃত কার মেয়ে? এবং সীতা শব্দের অর্থ কি?

আসরের সকলের মধ্যে একটা নীরবতার ঢেউ খেলে যায়। হঠাৎ বিদ্যুৎবেগে হরিহর খরিদ্দারদের সরিয়ে দোকান থেকে বেরিয়ে এসে বলে —এ উত্তর দিতে ত্রিভঙ্গ পারবে ক্যানে—এ পারবে মুরারি দা।

হাসির রোল পড়ে যায়। কেন না একজন নির্বোধ, বাস্তব জ্ঞান বর্জিত মানুষ মুরারি, সীতা প্রকৃত কার মেয়ে সে কি করে জানবে?

ত্রিভঙ্গ সরকারের মুখটা লাল হয়ে যায়। মুরারি এক গাল হেসে বলে—দোকানী হাসালে, একটা বিড়ি খঁইয়ে দাও।

এই ভাবে আসর জমে ওঠে। মাঝে মাঝে দারুণ উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। হরেন চ্যাটুজ্জার সঙ্গে বেশী জমে ত্রিভঙ্গ সরকারের। কেউই কমে যায় না।

বিক্রমপুর গ্রামটি বড় বিচিত্র ধরনের। মানুষগুলি বড় সজাগ। অবসর সময়ে নানা সমস্যা নিয়ে আলোচনা করে। বটতলা আসরের তারা নাম দিয়েছে 'জংশন'।

আসরে অংশগ্রহণ করায় অজ্ঞ মানুষও বুঝতে শিখেছে সমাজকে। ভালমন্দের জ্ঞান সকল মানুষেরই আছে। কিন্তু বুঝেও অন্যায় করে, চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি মানুষ করে। আবার অপরকে শোষণ করে নিজের আখের কি করে গুছোবে এ প্রবৃত্তি অধিকাংশ মানুষের আছে। কিন্তু কেন? মানুষ মানুষকে ভালবাসতে পারে না? পারে—কিন্তু করে না। এই তো সমস্যা বর্তমান সমাজের।

বেশ কয়েকদিন আগেকার কথা। দিনটা পূর্ণিমার আগের দিন। কাটা কাটা মেঘে সারা আকাশটা ঘেরা। আর এই মেঘের ফাঁকে ফাঁকে উজ্জ্বল চাঁদ একবার লুকোচ্ছে, আবার বেরোচ্ছে। সুন্দর এক দৃশ্য। এই সময় সরকার তার অনেক দিনের পুরনো লণ্ঠনটা নিয়ে কাশতে কাশতে এসে আসরের উঠানে বসে। চাটাই পেতে 'পদ্মপুরাণ'

বইটি যখন পড়তে শুরু করবে, যার জন্যে সকল লোক অধীর আগ্রহে বসে আছে, ঠিক সেই সময় একটি বিধবা রমণী এসে উপস্থিত। সরকারের চোখ ছুটি তার উপর পড়ায় জিজ্ঞাসা করে—কি গো জটার মা ?

সে মাথার কাপড়টা আরও একটু টেনে চুপ করে দাঁড়ায়। সকলের কৌতূহল বেড়ে যায়।

জটার বাবা অনেকদিন আগেই মারা গেছে। সংসার জীবনের সুখ-দুঃখের বোঝা তাকে বইতে হয় না। কিন্তু তার বিধবা স্ত্রী, তাকে সে যা দিয়ে গিয়েছে তার প্রচণ্ড ভারে সে মুহ্যমান। তারপর আর একটা শোক তার ঘাড়ে এসে পড়ল, তাই সে আরও শোকাতুরা।

তার একমাত্র কন্যা রেবতী। বহু কষ্টে, গায়ের রক্ত জল করে বিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু কিছু টাকা এবং একটি আংটি না দেওয়ার জন্য তার স্বামীর বিতৃষ্ণা এসেছে এবং রেবতীকে ত্যাগ করে অন্য পথ ধরেছে। তাই রেবতী তার মায়ের ঘাড়ে এসে বসেছে। এই অভিযোগ জটার মা শৈলদাসীর।

ত্রিভঙ্গ সরকার কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকে। তারপর আকাশের দিকে মুখ তুলে কি যেন মনে মনে বলে। তা হয়ত বোঝা না গেলেও, অনুমানে মনে হয় বর্তমান সমাজের জন্য আক্ষেপ। তার মুখ কালো হয়ে যায়। ক্রুদ্ধ হয়ে বলে সরোজকে ডাক তো।

সরোজ মুখার্জী গ্রামের নামকরা লোক। সকলেই মানে তাকে। লোকের সুখে দুঃখে সে অংশ নেয়। সরোজবাবু ডাকার সঙ্গে সঙ্গেই এসে উপস্থিত হয়—সরকারকা আমাকে কিজন্য ডেকেছেন ?

সরকারের চোখ ছুটি তখন অশ্রুপূর্ণ। সে নীরব। কিন্তু তার হৃদয় বড় উদগ্রীব এর একটা উপযুক্ত ব্যবস্থা করার জন্য।

তাই সে বলে—বাবা সরোজ, দেখ জটার মা অভিযোগ করেছে ওর মেয়ের স্বামী মেয়েকে ঘরে বসিয়ে দিয়ে গিয়েছে। কয়েকটা টাকা আর একটি আংটির জন্য রেবতীর জীবনটা নষ্ট হয়ে যাবে রে ?

—টাকাটা কত কাকা ?

—কত গো জটার মা ?

শৈল মুখ থেকে কাপড় সরিয়ে চোখ খুলে বলে—এক হাজার বাবা।

সরোজবাবু ক্ষেপা বাঘের মতো চিৎকার করে ওঠে— বেটার চামড়া খুলে পায়ের জুতো বানাব।

সরকার মিষ্টি সুরে বলে—সরোজ, তুমি পার। তুমি সবই পার। কিন্তু এ জোড়া লাগাতে গেলে হাতুড়ীর ঘা দিলে হবে না। ভালবাসার বাঁধন সুদৃঢ় করতে হবে।

— তাহলে কাকা, টাকা এবং আংটি দিয়ে দিতে হয়।

—হ্যাঁ হ্যাঁ। তবে তার আগে তুমি একবার রেবতীর কাছে গিয়ে সমস্ত জিনিসটা জেনে এস তো।

সরোজবাবু শৈলর সঙ্গে চলে যায়। বেশ কয়েকজন লোকও তাদের পিছু ধরে। সরকার চুপ করে বসে থাকে। কিছুক্ষণ পর ভোলার দিকে তাকিয়ে বলে—কি করে পরিবর্তন আনা যায়, বল দেখি ?

ভোলা বেশ কিছুক্ষণ ধরে বসে তামাক খাচ্ছিল। তার মাথায় পরিবর্তনের কোন কথা নেই। কারণ সে যা বোঝে তাতে রেবুর কোন সুরাহা হবে না। কিন্তু দোকানী হরিহর সব বোঝে। সে তাড়াতাড়ি দোকান থেকে বেরিয়ে এসে বলে—সরকার, ঠুকে দাও। তোমার তো সব আঁট-ঘাট জানা আছে।

সরকার তাড়াতাড়ি বলে— কেস তো করবই। তবে জিনিসটা কি জানিস, এ কেসে জোড়া লাগে না।

— হায়রানি তো হবে। পয়সা খরচ হবে। এতেই বুঝবে কত জলে কত মস্যুয়ী সেজে। আরও বুঝবে এ গাঁয়ে মানুষ আছে।

এদিকে খরিদ্দাররা ডাকাডাকি করতে থাকে—দোকানী, ও দোকানী, এস ক্যানে, দোকান দাও······

বিরক্ত হয়ে হরিহর বলে—আর পারলাম না তোদিকে নিয়ে। লিবি তো চার পয়সার জিনিস।

হরিহর বিরক্ত হয়ে দোকানে ঢোকে।

এদিকে রেবতী ঘরে চুপ করে বসে আছে। তার চোখের কোণে বন্যা। সংসার জীবনে হয়ত আর সে সুখের আলো দেখতে পাবে না। এই চিন্তায় সে মুহ্যমান। তাই তাকিয়ে থাকে অন্ধকারের দিকে।

এমন সময় সরোজবাবু এসে হাজির হয়। সে সরাসরি রেবতীকে জিজ্ঞাসা করে—তোকে তাড়িয়ে দিয়েছে কেন?

রেবতী কথা বলে না। নীরবতাই তার কাছে একমাত্র সম্পদ বলে মনে হয়।

কয়েকবার জিজ্ঞাসা করার পর শৈল ক্ষুব্ধ হয়ে বলে—টাকা আর....

—থাক, তোমাকে তো বলতে বলি নি।

শৈল ছুটে রেবতীর কাছে গিয়ে বলে—বল মা, তোর সমস্ত কথা খুলে বল। যদি কোন ব্যবস্থা হয় মা, ত্যাখ।

রেবতী নিজেকে শক্ত সমর্থ করে নিজের দুঃখের কথা খুলে বলতে থাকে—অকথ্য অত্যাচার করে। কেবল বলে, আংটি আর টাকা দিলি না। তোর স্থান নাই।

সরোজবাবু শৈলজাকে জিজ্ঞাসা করে—তোমার মেয়ের স্বামীর নাম কি?

—সন্তু দাস।

তারপর সরোজবাবু রেবতীকে জিজ্ঞাসা করে—আরে রেবু, সন্তু কি অন্য পথ ধরেছে নাকি?

প্রশ্নটা আচমকা তার কানে বাণের মতো বেঁধে।

—হ্যাঁ।

সরোজবাবু আর কোন কথা না বলে শৈলকে বলে— কিছু পয়সা খরচ করতে হবে।

—কোথা পাব। সহজে হাঁড়ি চড়ে না।

—যাক, দেখছি। অন্যভাবে ব্যবস্থা করতে হবে। না হলে সেখ পাড়ায় চাঁদা তুলব।

সরোজবাবু চলে আসে। আর চিন্তা করে—একটি আংটি আর কয়েকটি টাকার জন্য রেবতী জব্দ। সন্তু তো বুক ফুলিয়ে সংসার

করবে। কিন্তু রেবতী ?....ঘুঘুর বাসা না দেখিয়ে ছাড়ব না। আমার নাম সরোজ মুখোজ্যা।

।। দুই ।।

তখন সকাল সাতটা। ত্রিভঙ্গ সরকার নিজের বাড়ীর দাওয়ায় বসে তামাক খাচ্ছে। তার কাছে তার আরও কয়েকজন লোক বসে আছে। সরকার তাদের সঙ্গে গল্পে মশগুল।

এমন সময় সরোজবাবু সেখানে উপস্থিত হয়। সরোজবাবুকে দেখে বলল—কি হল শেষ পর্যন্ত ?

—কি আর হবে, কেস ছাড়া আর কোন উপায় নাই।

— ক্যানে, বেটা অন্য রাস্তা ধরেছে নাকি ?

—তা না হলে কি আর এই অবস্থা হয়।

—ঠিক আছে, কালকেই পরিতোষবাবুকে দিয়ে ওর নামে এক মকদ্দমা জুড়ে দিছি।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর বলে—তা তো হল, কিছু টাকা-পয়সা তো দরকার। উকিল বলে কথা। কোর্টে তো দেখছি পয়সার জন্য 'ওরা' কি করে। উকিলের সঙ্গে সঙ্গে মহুরী তো পকেট সার্চ করে।

সরোজবাবু তাড়াতাড়ি বলে—এ বিষয়ে কিছু ভাববার নাই। গাঁয়ের যে ছেলেটি এখন একটু মস্তান গোছের, যার নাম নারায়ণ রায়, ওকে কিছু চাঁদা তোলার ভার দিয়েছি, গ্রামের উন্নতির জন্য।

—নারায়ণ মানে, কোন্ ছেলেটার কথা বলছ ?

সরোজবাবু বেশ হরশ-পরশ হয়ে বলে—অধর রায়ের বেটা।

—ও তাই বলো। ছেলেটি বেশ ভাল। আমার কাছে বেশ কয়েক দিন বেড়াতে এসেছিল। ব্যবহার খুবই ভাল। পরোপকারীও বটে।

—হ্যাঁ, গ্রামের সার্বিক উন্নতির জন্য এখন ও চেষ্টা করছে। আর ওদের ছাড়া তো লোকে চাঁদা দেবে না।

—হাঃ-হাঃ-হাঃ, এটা সব যুগেই আছে। গায়ের বল না থাকলে কেউ মানে না। বর্তমানে পয়সাটা কিছুটা গায়ের বলের কাজ করছে। ......ঠিক আছে, তা হলে নারায়ণকে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও। আর তোমাকে সিউড়ী যেতে হবে। রেবতী আর ওর মাকে আমার সঙ্গে যেতে বলে দাও।

—ঠিক আছে, আমি নারায়ণকে পাঠিয়ে দিছি গা। আর ওদেরকেও বলে দিছি।

এই বলে সরোজবাবু চলে যায়।

মানুষের জীবন বিচিত্র ধরনের। এই জীবনের মধ্যে যেমন বিপর্যয় আসে, তেমনি দারুণ সুখ জীবনকে আলোকিত করে।

সমাজ রেবতীর উপর অত্যাচার করতে লজ্জা পায় না। কি করে পাবে? মনুষ্যত্ব যদি মানুষের না থাকে তবে মানুষ কি সত্যই মানুষ? রেবতীকে আজ কোর্টের আশ্রয় নিতে হচ্ছে। কেন সে মান ইজ্জত দিয়ে স্বামীর কাছে ফিরে যাবে? কেন সে সতী হবে? আদালত তাকে তার স্বামীর কাছে ফিরিয়ে দিতে পারে, কিন্তু ভালবাসা ফিরিয়ে আনতে পারে না।

সূর্যের পুনরাগমনে আবার কালো আকাশে সকাল ফিরে আসে। ত্রিভঙ্গ সরকার শৈলজা এবং রেবতীকে নিয়ে আদালতে উপস্থিত হয়।

আদালতে কেস হয়ে যায়। একদিকে রেবতী, অন্যদিকে সন্তু দাস। সন্তুর ডাক পড়ে। দিনটা সাতই শ্রাবণ। রেবতী, শৈল এবং সরকার আদালতে উপস্থিত হয়।

রেবতীর জয় হয়। সন্তু রেবতীকে স্ত্রী বলে স্বীকার করে নিজের বাড়ী নিয়ে যায়। ত্রিভঙ্গ এবং শৈলজা অতি প্রশান্ত মনে ঘরে ফেরে।

সরকারের নাম গ্রামে আরও বেড়ে যায়। সকলের কাছে জিনিসটা ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে বৃহৎ করে সে অজস্র প্রশংসা কুড়ায়। সকলে ভাবে,

রেবতী সত্যিই সুখী হল। শৈলজার মুখে মৃদু হাসি ফুটে উঠে। কিন্তু করুণ রাগিণীর স্রোত রেবতীর মাথা হতে পা পর্যন্ত আনাগোনা করতে থাকে। রেবতী কঠোর বাস্তবের সম্মুখীন হয়।

রেবতী শ্বশুরবাড়ী ফিরতেই তাকে সর্বনাশের কালো ছায়া আচ্ছন্ন করে। রেবতী সকলের মনের অবস্থা বুঝতে পারে। বাড়ীশুদ্ধ লোক তার বিরুদ্ধে। কেউ তাকে জল গ্রহণ করতে বলে না, বসতে বলা তো দূরের কথা। চোখের জলে রেবতীর বুক ভিজে যায়। তারপর সন্তর মুখ হতে জানতে পারে এ সংসারে তার স্থান নেই। চলা খাওয়া সব কিছুতেই শাশুড়ীর বিদ্বেষ বাণ—টাকা দেয় না স্বামীঘর করবে।

খাওয়ার ব্যাপারে অত্যধিক কার্পণ্যে তাকে দগ্ধিয়ে মারার চেষ্টা করে। রেবতী একা। নিঃসঙ্গতাই যেন তার সঙ্গী। চোখের সামনে নতুন বৌ-এর চলা ফেরা। রেবতীর অশ্রু বুক ভেজাতে থাকে। সে সন্তর সকল উদ্দেশ্য বুঝতে পারে, সে সতীত্ব বিসর্জন দিয়ে স্বামীকে মনে মনে অভিশাপ দেয়।

অপ্রত্যাশিত দুঃখ আর চিরন্তন হাহাকারই রেবতীর একমাত্র সম্বল হয়। পৃথিবীকে চিনতে পারে, বুঝতে পারে এ সমাজে তার স্থান নেই। সংসার তার কাছে অসার বলে মনে হয়। শুধু নিজে নিজেকে বোঝাবার চেষ্টা করে। কিন্তু চোখের জল ধরে রাখতে পারে না।

তারপর স্বামীর অমানুষিক অত্যাচার, শাশুড়ীর দাঁত খিঁচুনি রেবতীকে নৈরাশ্যের সীমাহীন অন্ধকারে ফেলে। তবুও রেবতী চোখের জল আর অসীম ধৈর্য নিয়ে কোন রকমে দিনপাত করতে থাকে।

এদিকে বেশ কিছুদিন হতে রেবতীর খবর না পেয়ে শৈলজার মন খুব খারাপ হয়। তাই শৈলজা গ্রামের একটি ছেলেকে নিয়ে পলাশপুর অভিমুখে রওনা হয়।

গ্রামটি ময়ূরাক্ষী নদীর উপরে। ময়ূরাক্ষীর ধার উঁচু করে বাঁধানো। বাঁধের উপর সারি সারি তাল গাছ। মাঝখান দিয়ে সরু

রাস্তা। বাস হতে নেমে ঐ রাস্তার উপর দিয়ে দু মাইল যাওয়ার পর ক্ষুদ্র গ্রাম পলাশপুর। শৈলকে গ্রামের মানুষ ভালবাসে এবং সে গ্রামে শৈলজা নামেই পরিচিত।

শৈলজা যখন হটি´ন নগরের কালীতলায় নামে তখন বেলা গড়িয়ে গিয়েছে। নদীর ধারে জেলেরা জাল ফেলে বসে আছে। তাদের কাছে বড় বড় মাছও আছে। সেই মাছগুলি দেখে যে ছেলেটি শৈলজার সঙ্গে যাচ্ছিল সে নদীতে নেমে দেখতে উদ্যত হলে শৈল বলে—বাবা নিতাই, যাস্ না। তাড়াতাড়ি যেতে হবে। না হলে রাত হয়ে যাবে।

—জান পিসি, একটো মাছ নিয়ে গেলে জামাইবাবু খুবই খুশি হবে।

যদিও শৈলজা মাছ খায় না। কিন্তু মেয়ে জামাইয়ের জন্য একটা মাছ কেনার প্রস্তাব মন্দ লাগে না। তাই বলে—বাবা নিতাই, মাছের দাম কত?

নিতাই তাড়াতাড়ি শুধিয়ে বলে—পিসি, দশ টাকা বলছে।

শৈলজা তাড়াতাড়ি কাপড়ের খুঁট খুলে অবাক হয়ে যায়। মোটে পুঁজি দু টাকা। তাই মাছ না নিয়ে রাস্তা ধরে।

দশ বার বছরের নিতাই ছুটে ছুটে যেতে থাকে। ঝোপ ঝোপ গাছের মধ্যে মাঝে মাঝে সে মিলিয়ে যায় আবার শৈলজার সঙ্গ নেয়। এইভাবে তারা যখন পলাশপুর গ্রামে উপস্থিত হয় তখন সূর্য ডুবে গেছে। গ্রামের ছেলেমেয়েদের কলরব আকাশ মাতিয়ে তুলছে। ছোট্ট নিতাইয়েরও মনে পড়তে থাকে, তার গ্রামের এই বিকালের কথা—পিসি, ওরা বুঝি চাঁদমারামারি খেলছে? আমি গেলে পাঁচ চাঁদ দিতাম।

শৈল বলে—তাই হবে।

অনেক দিন পর শৈল এই গ্রামে প্রবেশ করে। এর মধ্যে অনেক পরিবর্তনের ঢেউ খেলে গেছে। তবুও শৈল রেবতীদের রাস্তা চিনতে পারে। যারা তাকে চেনে তারা তার কুশল জিজ্ঞাসা করে। কিন্তু কেউ রেবতীর কথা বলে না।

তারপর একটা ছোট ডোবার পাশ দিয়ে শৈলজা রেবতীদের ঘরের দরজায় পৌঁছে দেখে সেই সুন্দর চেহারায় মালিন্য দেখা দিয়েছে। একটা জীর্ণ শাড়ী পরে বাহির দরজায় দুই দিন উপবাসী অশ্রুসিক্ত নয়নে রেবতী দাঁড়িয়ে আছে। রেবতীকে দেখে শৈলজা চমকে উঠে—রেবু !

রেবতীও তাকে দেখে বিস্ময়ে অবাক হয়ে যায়। আঁচল দিয়ে চোখ মুছে বলে—মা, ভাল আছিস ?

—মা রেবু, তোকে অমন লাগছে ক্যানে ?

শৈলজার কথা শুনতে পেয়ে রেবতীর শাশুড়ী এবং সতীন নির্মলা বেরিয়ে আসে।

নির্মলাকে শৈল চিনতে পারে না। বেহানের কুশল জিজ্ঞাসা করে, কিন্তু উত্তর পায় না। শৈলজার কৌতূহল বেড়ে যায়। অনাহুতের মতো বাড়ীর ভিতর ঢোকে।

রেবতীর কান্না অবশ্য তখনও থামে নি। সে কান্না যদিও থামবার নয়। কারণ তার শুকনো বাগানে শৈলজা কোথায় জল পাবে ? তার শুকনো সান্ত্বনা হয়ত চিরদিনের সঙ্গী হবে।

শৈলজার অনুমানের পথে আর একটাও পাথর থাকে না। কারণ রেবতী তাকে এই মেয়েটির কথা বলেছিল।

অন্ধকার ঘোর হয়ে নেমে আসে। আসে গ্রামের নির্জনতা। রাত্রি প্রায় আটটা। পাড়া প্রতিবেশীদের কেউ শোয়ার কেউ খাওয়ার পর্ব শুরু করেছে, এমন সময় সন্তু প্রবেশ করে। রেবতী এবং শৈলজা নিতাইকে নিয়ে একপাশে চুপ করে বসে আছে। নির্মলা মাঝে মাঝে তাদের খাওয়াব জন্য অনুরোধ করতে থাকে এবং দিতেও থাকে।

কিন্তু সন্তু তাদের প্রতি কোন কর্তব্যই প্রদর্শন করে না। শৈলজা কারে—কি বাবা সন্তু, ভাল আছ ?

সন্তু তাচ্ছিল্যের সুরে বলে—ভাল নাই।

বিতৃষ্ণায় ভরা তার হৃদয়, শৈলজা বুঝতে পারে। সে মরিয়া হয়ে বলে—বাবা সন্তু, সর্বনাশ করলা। রেবুকে জলে ফেলে দিলা, বাবা।

—জলে কোথা ফেলেছি। ঘরেই তো আছে।

—কি বুঝবা বাবা নারী জীবনের আক্ষেপ কোথা ?

—জিনিসটা তো আপনারাই ঘোরালো করছেন।

—ঠিক আছে বাবা, তোমরাই সুখে থাক। আমাদের দুখের জীবন দুখেই কাটুক।

সন্তু কোন কথা না বলে খাওয়ার জন্য চলে যায়।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যেতে থাকে। প্রচণ্ড দুশ্চিন্তার মধ্যে রেবতী নিদ্রার কোলে এলিয়ে পড়ে। কিন্তু হতভাগিনী শৈলজার ঘুম আসে না। রেবতী শিশুকন্যা। তার চিন্তা তার মায়ের মতো গভীর নয়। মায়ের হেল্লায় যখন সে আছে তখন কিছু ব্যবস্থা মা করবেই, এই তার সান্ত্বনা। কিন্তু শৈলজা অন্ধকার হতে অন্ধকারে হারিয়ে যেতে থাকে। সূর্যাস্তের পর কাকে সে মুখ দেখাবে ? গ্রামের মানুষের কাছে কি বলবে ? নিঃসঙ্গ একাকী রেবতীকেই বা কী বলে সান্ত্বনা দেবে ? এ যেন তারই বেদনা, কষ্টকর কষ্ট।

সকাল হয়ে আসে। রেবতীকে ডেকে বলে—রেবু, ওঠ মা। চল, আমরা আমাদের ঘরে চলে যাই।

রেবতী পাশ ঘুরে শুয়ে বালিশে মুখ লাগিয়ে বলে—গাঁয়ে কী বলব মা ?

—যা হয় কিছু বলতে হবে।

—না মা, আমি যাব না। আমি গাঁয়ে আর মুখ দেখাতে পারব না। আসরের লোকেরা কি বলবে ? আমাকে একটু বিষ দে মা।

এই বলে সে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। তার চোখের জল শুষ্ক মরুভূমিতে বন্যা আনে।

শৈলজা চোখের জল চেপে সাহস দিয়ে বলল—আমি থাকতে তোকে জলে ফেলে দেব না রেবু।

রেবতী বড় নম্র। চোখের জল ফেলতে পারলেই সে যেন বাঁচে। তার প্রতিবাদের ভাষা নেই। কি করে থাকবে ? একে গ্রামের গৃহকোণে মানুষ হয়েছে। তারপর অল্প বয়স। তাই তার পরিণাম....।

শৈলজা উপায় খুঁজে না পেয়ে গৃহত্যাগের জন্য প্রস্তুত হতে থাকে।

সন্তুকে ডেকে বলে—বাবা সন্তু, পণে আমি যে জিনিসগুলো দিয়েছিলাম, সেগুলি ফিরে দাও।

সন্তু রেগে বলে—কেন দেব? এতদিন যে খেলে তার দাম নাই বুঝি, খুব মজা। ওসব কথা বললে মুখ ভেঙে দেব।

রেবতী ফুঁপিয়ে উঠে। শৈলজা আক্ষেপের সুরে বলে—তুমি সুখী হও বাবা।

তারপর শৈলজা ঘরের সকলকে বিদায় জানায়। কেউ তাদের কিছু বলে না। অবশেষে শৈলজা, নিতাই আর রেবতী রাস্তায় নেমে পড়ে। পাড়া প্রতিবেশী কেউ কেউ তাদের কুশল জিজ্ঞাসা করে—রেবু, চলে যেছ ক্যানে?

কিন্তু রেবতী কোন উত্তর দেয় না। রেবতী পলাশপুর গ্রামকে দেয় দু ফোঁটা চোখের জল। অন্যায়ভাবে একটা জীবনকে যে সমাজ সাগরের জলে ভাসিয়ে দিতে পারে সে সমাজকে রেবতী দেয় অভিশাপ।

পলাশপুর ছেড়ে রেবতীরা ছোট রাস্তা ধরে। বড় পরিচিত রাস্তা, রাস্তার সকল জিনিস তার চেনা। নিতাই মাঝে মাঝে গাছের নাম, নদীর নাম, পাশের গ্রামের নাম জিজ্ঞাসা করতে থাকে। কিন্তু সে উত্তর সংগ্রহ করতে পারে না। অবশেষে বাসে করে বিক্রমপুর অভিমুখে রওনা হয়।

॥ তিন ॥

লজ্জার সর্বগ্রাসী আগুন রেবতীর সারা দেহ পুড়িয়ে দিতে থাকে। প্রখর সূর্যের কিরণ আকাশের বুকে ক্লান্তির ঢেউ খেলিয়ে দিচ্ছে।

নিকটবর্তী বাসষ্ট্যাণ্ড হতে নেমে রেবতী এবং তার মা বিক্রমপুর গ্রাম অভিমুখে চলে। আগে আগে চলে নিতাই।

পৃথিবীর কোন মানুষের কথা তাদের মনে পড়ে না। একজন মানুষ তাদের সব সুখ কেড়ে নিয়েছে। শৈলজা আপন মনে বলতে থাকে—কত কষ্ট, কত দুঃখ সহ্য করে রেবু তোকে মানুষ করেছি, মা। সেই দুঃখ একটু কমবে ভেবেছিলাম, কিন্তু তা আর হল না। হায় ঠাকুর, তোমার চোখ নাই, হৃদয় নাই।

বিরহের বেদনা বড় কঠিন। সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে মৃত্যুর দ্বার-প্রান্তে উপনীত হওয়ার ডাক দেয়। রেবতীকেও যেন ডাক দিয়েছে! তার পোড়া মুখ আর গ্রামে দেখাতে ইচ্ছা হয় না।

একজন সমাজের বুকে বুক ফুলিয়ে বাস করছে। আর একজন চোখের জলে মাটি ভিজোচ্ছে। ধন্য সংসার। কেন এই সহ্য? কেন নারী কলঙ্কিত? সমাজ কেন পারে না তাকে নতুন জীবন দান করতে? শুধু সহ্য—সহ্য—সহ্য, সীমাহীন সহ্য।

যত গ্রামের কাছাকাছি আসতে থাকে ততই তাদের ব্যথা গুমরে গুমরে উঠতে থাকে। কিন্তু চোখের জলে কি সমাজের শাস্তি আসে? সংসার জীবন তো সংগ্রামের ক্ষেত্র। আর এই সংগ্রাম শুরু হয় জন্মের মধ্য দিয়ে। কাটাকাটি মারামারি না করলে যে সংগ্রাম হয় না তা নয়, জীবন ধারণের জন্য মানুষের সংগ্রাম চিরন্তন। সুতরাং সহ্য নয়, সমুদ্র গর্ভে পড়লেও তাকে সাঁতার দিয়ে তীরে উঠতে হবে। না হলে জীবন সংগ্রাম তো শেষ।

পৃথিবীতে মানুষ আসে মৃত্যুবরণ করবার জন্য নয়, ভোগের জন্য। এই পৃথিবী ভোগের পৃথিবী।

কিন্তু বর্তমানে প্রচণ্ড দুঃখের দাপটে রেবতী নিজেকে পৃথিবী থেকে হারিয়ে দিতে চায়। সেটা হয়ত স্বাভাবিক, তাই সে আর গ্রামে ঢুকতে চায় না।

ছুটে আসে গ্রামের শত শত মানুষ। তারপর জিজ্ঞাসার পর জিজ্ঞাসা। রেবতীর অন্তর বীণায় তখন দুঃখের ঝড় উঠেছে। ধূ-ধূ

বালুকাময় হৃদয়ে যা এনেছে তা তিক্ততা।

শৈলজার চিন্তার বিষয় - রেবতীকে হয়ত সংসার থেকে সরে যেতে হবে। গাঁ ঘরের কেউ দেখবে না। স্বামীর মুখও আর দেখতে পাবে না।...রেবু জীবনে দুঃখ পায় নি। জটাকে হারিয়ে ছেলের মতো করে মানুষ করেছি। কিন্তু সারা পৃথিবী আজ তার কাছে অন্ধকার।

কি নিষ্ঠুর রেবুর শাশুড়ী! কী শয়তান সন্তু!

গ্রামের সকলের কাছেই খবর পোঁছে যায়। গ্রামের জঘন্য রাজনীতির খেলা থাকলেও রেবতীদের প্রতি সকলের সহানুভূতি আছে। ত্রিভঙ্গ সরকারও বসে আছে হরি শুঁড়ির বাড়ীর 'কানঠা'য় প্রকৃত ব্যাপারটা জানার জন্য। শৈলজা চোখের জলে সব কিছু জানিয়ে দেয়।

সরকারের একদিকে চোখের জল, অন্যদিকে বাঁধন ছাড়া রাগ। যেন তার ধ্বংসকারী হুঙ্কার। মাথার গামছাটা তুলে চোখের জল মুছে বলে—চল, বাড়ী চল। পরে দেখা যাবে।

অবশ্য সরকার যে খাতিরটা পেয়েছিল রেবুকে শ্বশুরবাড়ী পাঠিয়ে, সেই খাতিরটা কিছুটা ম্লান হয়ে গেল। এটা তার প্রেস্‌টিজ ইস্যু। তাই গভীর ভাবে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে।

শৈলজা গৃহে ফিরল। রেবুর সারা মুখটা ঘুমটায় ঢাকা। তবে তার ঘুমটার ফাঁকে ফাঁকে পাড়া প্রতিবেশীর সান্ত্বনা বাণী প্রবেশ করতে লাগল—সরকার এবং সরোজবাবু যখন আছে, তখন কিছু একটা ব্যবস্থা হবেই।

রেবতীর বুকফাটা জিজ্ঞাসা চার দেওয়ালের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে কোলাহল মুখরিত গ্রামে আলোড়ন সৃষ্টি করে। বুঝিয়ে দেয় — মানুষ কি স্থবির, পঙ্গু হয়ে অন্ধকারেই থাকবে? জীবন কি শুধু কুঁড়ে ঘরের প্রদীপ?

বেলা অবসান হয়ে আসতে থাকে। সূর্যের তেজও কমতে থাকে। অবশেষে আকাশের বুকে কালো ছায়া নেমে আসে।

প্রচণ্ড তাপের পর গ্রামের বুকে ঠাণ্ডা হাওয়া বইতে থাকে। শৈলজা পূর্বের ন্যায় ঘরের বাইরে প্রদীপ দেখায়। পাশের বাড়ী থেকে

শাঁখের শব্দ আসে। কিন্তু শৈলজার কানে কোন শব্দ প্রবেশ করে না। একটা দুঃখের আবরণে শুধু শোনে ধুমধাম শব্দ। সে প্রদীপ নিয়ে প্রণাম করে। ধন দাও, যশ দাও, সুখ দাও না বলে, বলে ঈশ্বর মহা শয়তান! জীবনে বহু পূজো সে করেছে। বহু উপোস করেছে। বহু ব্রত করেছে। তার পরিণামে পুত্রকে হারিয়েছে (জটাকে), স্বামীকে হারিয়েছে, এর পর মেয়ের দুঃখ! তাই তার জীবন জিজ্ঞাসা—বড় করুণ আর্তনাদ।

রাত্রি আটটা হতেই মুদিখানায় বেশ কয়েকজন লোক জমা হয়। সকলের মধ্যে আলোচনাটা রেবতীকে ঘিরে শুরু হয়। কেউ কেউ বলতে থাকে—রেবতী শিমুল ফুলের মতো কেন বিক্রমপুরে পড়ে থাকবে?

সকলের মধ্যে একটা দুঃখপূর্ণ আলোচনা চলতে থাকে। এমন সময় ত্রিভঙ্গ সরকার নারায়ণের সঙ্গে কাশতে কাশতে আসরে এসে উপস্থিত। মদন পাল তাড়াতাড়ি চাটাইটা পেতে দিয়ে বলে—বসুন সরকার মশাই, বসুন, বসুন।

মুখটা বড় গম্ভীর। অভ্যাসে তামাক টেনে চলেছে। কিছুক্ষণ পর চাটাই-এর উপর গড়গড়াটি রেখে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে। দোকানী হরিহর তাড়াতাড়ি দোকান হতে বেরিয়ে এসে বলে—সরকার মশাই, পারলা না তো ···

তারপর আবার ঢুকে গিয়ে আরম্ভ করে—তোর হল পাঁচ পয়সার লঙ্কা, পাঁচ পয়সার কেরোসিন, দু পয়সার কাঠি।

বার পয়সার খরিদ্দারটি দোকান নিয়ে করুণ সুরে বলে—দোকানী, পয়সা নাই আজ, কাল দেব।

দোকানীর মেজাজ চরমে ওঠে। মুখটা বিকৃত করে বলে ওঠে—তখন চাইতে গেলে বলবি, গাঁ ছেড়ে পালছি নাকি—? এখুনি পয়সা দে।

খরিদ্দারটির মুখ লাল হয়ে যায়। এই অভাগা দেশের মানুষের চার পয়সারও সংস্থান নেই। তাই নীরবে অনেক কিছুই সহ্য করতে হয়। খরিদ্দারটি মুখ নিচু করে জিনিসগুলি রেখে চলে যায়।

দোকানী আবার একজনের হিসাব আরম্ভ করে। পাঁচ আর পাঁচে দশ আর আটে আঠার। এমন সময় পাশ হতে একজন বলে— দোকানী, পাঁচ নয়ার খয়ের দাও তো।

ক্রুদ্ধ হয়ে হরিহর বলে—কোথাকার কেরে, পাঁচ নয়ার খয়ের নেবে। চেরু মড়নের দোকান যা।

এদিকে ত্রিভঙ্গ সরকারের গা বেয়ে ঘাম ঝড়ছে। কোন উপায় খুঁজে পাচ্ছে না। আঠার-উনিশ বছরের বালিকার জীবনে যে কালিমা পড়েছে তা যেন চিরন্তন। সমাজে তার স্থান নেই। গণিকা জীবনে তাকে নাম লেখাতে হবে। সে পতিতা হবে। জীবন হবে বিষময়। সরকারের মাথার মধ্যে ওই চিন্তাগুলি ঘুরতে থাকে। আর মাঝে মাঝে 'কি উপায় কি উপায়' বলে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে থাকে।

নারায়ণ থাকতে না পেরে বলে ওঠে—ওরকম 'মাইরি মাইরি' করলে হবে না। চল, একবার সবাই মিলে বেটাকে দেখে আসি।

সরকার হেসে বলে—বাবা, তোর কথাগুলো ছেলেমানুষের মতো। জানি তোর হৃদয় আছে। গ্রামের উন্নতির জন্য তোর যথেষ্ট তৎপরতা দেখছি। কিন্তু কি জানিস, এ কেরোসিনের আগুন, একে গ্যাস দিয়ে নেভাতে হয়। ভালবাসার বন্ধন জোড়া লাগা খুব কঠিন— খুবই কঠিন।

আসরের অনেকের মুখ থেকে বেরিয়ে আসে—শয়তান, একটা নারীর জীবনকে শেষ করে দিল। একবার তার জীবনের কথা চিন্তা করল না।

আমাদের সমাজ নিজের জীবনের জন্য কষে। কিন্তু অপরের জীবনে শেল বিঁধে দিয়ে শোষণের হাত প্রসারিত করতে কুণ্ঠা বোধ করে না।

তবে ত্রিভঙ্গ সরকার ব্যাতিক্রম। সে কিন্তু পারে চোখের জলের

মর্যাদা দিতে। একটা নারী চোখের জল ফেলে, অসহ্য কষ্ট সহ্য করে এক কোণে পড়ে আছে, আর একটা জীবন সুখের নৌকায় ঘোরাফেরা করছে। এর যোগ্য জবাব দেওয়ার ক্ষমতা সরকারের আছে।

রাত দশটা হতেই একে একে সবাই আসর ত্যাগ করতে থাকে। সরকারও বাড়ী যেতে উদ্যত হলে নারায়ণ বলে—সরকারকা, আমার একটা কথা শোন!

— কি কথা?

নারায়ণ ডান হাতের বুড়ো আঙুলটি কামড়াতে কামড়াতে বলে— রেবতীর পুনরায় বিয়ের ব্যবস্থা কর গ্রাম থেকে।

সরকার একটু হেসে বলে—কে উপায় করবে?

—কেন? এ রকম তো অনেক হচ্ছে। ঐ ভাঁটপাড়ার হরকাকা বিয়ের জন্য একটা মেয়ে খুঁজছিল। সে দোজবর।

সরকার উচ্চৈস্বরে হেসে ওঠে—বয়স কত?

—পঞ্চাশের কাছাকাছি।

—আঠার বছরের বালিকার সঙ্গে ঐ বুড়োর বিয়ে দিয়ে কি জীবনটা জলে ফেলে দিবি?

—কেন? সুধীর চ্যাটুজ্যার মেয়ে সরমার কি করে হোল?

সরকারের গলা রুদ্ধ হয়ে আসে। মুখ দিয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস নেয়। বলে—জানিস বাবা, ঐ রকম বিয়েতে নারীর চোখের জল গুমরে গুমরে ঝরে। সহ্য করতে হয় বহু কষ্টে।

সংশয়ের দাগ কাটে নারায়ণের মনে। তার মনে হয়, তারও একটা কর্তব্য আছে রেবতীর প্রতি। স্বামী পরিত্যক্তা রেবতীকে পতিতার বেশে কোন দিনই রাখা উচিত নয়।

—বাবা নারায়ণ, তার চেয়ে এক কাজ করতে পারিস?

—কি কাজ কাকা?

—তুই বরং কাল সরোজকে নিয়ে সরকার পাড়া যা, সেখানে আনন্দ দাস আছে। আমার নাম করে রেবতীর সঙ্গে ওর ছেলের বিয়ের কথা বলবি।

—ঠিক আছে, কালই যাব।

নারায়ণের শরীরটা কাঁটা দিয়ে ওঠে। গা দিয়ে কল কল করে ঘাম ঝরতে থাকে। রুদ্ধ হয়ে আসে গলার স্বর। দুই বার খক্ খক্ করে কেশে আপন মনে কি যেন বলতে যায়। কিন্তু আবার চেপে যায়।

সরকার বলে—যা, বাড়ী যা। আজ আর রাত করিস না।

—ঠিক আছে কাকা, তুমি বাড়ী যাও, আমিও যাচ্ছি।

তারপর নারায়ণ চলে যায়। পরে সরকার কাশতে কাশতে লণ্ঠন নিয়ে বাড়ী অভিমুখে রওনা হয় আসরকে বিদায় দিয়ে।

বাড়ীতে এসে নারায়ণ দারুণ চিন্তার মধ্যে পড়ে। সে বর্তমান সমাজের একজন আধুনিক যুবক। মনটা বড়ই ভালো। কিন্তু এক-গুঁয়ে। সে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। কিন্তু কোন উপায় দেখতে পায় না। শুধু মনে মনে বলে -রেবুকে যোগ্য হতে হবে। কোমর বেঁধে সংসার জীবনে নামতে হবে। লজ্জাকে নিঃসংকোচে ত্যাগ করতে হবে। বসে থাকার দিন নয়।

কিন্তু রেবতী কি পারবে? গ্রামের এক কোণের বালিকা, সংসার জীবনে ক্ষতবিক্ষত প্রাণা নারী। কোমর বেঁধে রাস্তায় নামতে গেলে প্রচণ্ড বিদ্রূপের সম্মুখীন হতে হবে। নারায়ণ হয়ত আনতে পারবে, কিন্তু তাকে বেহায়া সাজতে হবে, নষ্টা নাম কিনতে হবে, সমাজ ধিক্কার দেবে, অট্টহাসিতে মুখ কুঁচকে যাবে, কিন্তু কোন ব্যবস্থা করবে না।

বিস্ময়ে অবাক হতে হয় যখন মনে পড়ে ভাটপাড়ার হরকালী তার আঠার বছরের মেয়ের সঙ্গে একজন পঞ্চাশ বছরের বৃদ্ধর বিয়ে দিল পয়সার অভাবে। মেয়েটির নাম দেবকী। দেবকী চোখের জলে ভাসিয়ে দেয়। বিষের কৌটা হাতে নিয়ে জীবন বিসর্জন দিতে যায়। কিন্তু সে মৃত্যুতে বাধা আসে। তারপর অসীম ধৈর্য নিয়ে চোখের জল শেষ করে আবার সংসারে উত্তীর্ণ হয় কয়েক দিনের জন্য।

ঘোর অন্ধকারে গ্রামটা ঢাকা। গ্রামের রাস্তার দুধারে উঁচু উঁচু

খড়ের চালের বাড়ীগুলো যেন নিদ্রামগ্ন। গ্রামের মাঝে মাঝে উঁচু উঁচু গাছগুলো ঝোঁপ হয়ে যেন প্রহরীর কাজ করছে। রাস্তাগুলো যত্নের অভাবে বড় শোচনীয় হয়ে পড়েছে। তার উপর আবার গ্রামের লোকের অত্যাচারে তা আরও সংকীর্ণ হয়ে মানুষ যাওয়ার উপযোগী হয়ে গোগাড়ী যাওয়ার অনুপোযোগী হয়েছে।

নিস্তব্ধ রাত। মাঝে মাঝে শন্ শন্ শব্দ। যেন জনহীন প্রান্তর, অন্ধকার সাহারা। আর এই সাহারায় এক উট এক প্রান্ত হতে অন্য প্রান্তে যাওয়ার জন্য ছুটছে; জলের সন্ধানে নয় সুখের সন্ধানে, আলোর সন্ধানে নয় সূর্যের সন্ধানে। সূর্যকে সে বলতে চায়, তার উত্তাপ যেন আরও প্রবল হয়। তাতে যেন সমস্ত গাছপালা পুড়ে যায়, আমরা যেন এইখানে শেষ হতে পারি।

অনেক রাত। অবশ্য নারায়ণ এত রাতেই বাড়ি যায়। সে দলনেতা। গ্রামের উন্নতি করতে চায়। গ্রামে সে সংগঠন করে। তাই তার ফিরতে দেরি হয়। মা বাবা, ভাই বোন কেউ তাকে দেখতে পারে না। অশান্তি হয়। কিন্তু নারায়ণ ভ্রূক্ষেপহীন। সে নিজের মতো করে নিজেকে চালাতে চায়। অবশ্য গ্রামের লোকে তাকে ভালবাসে। কারণ সে অনেক ন্যায় অন্যায় কাজ করে গ্রামের মানুষ-দের ভালোর জন্য। সে একজন আধুনিক যুবক। বর্তমান সমাজ ব্যবস্থা থেকে একটু দূরে। দূরদৃষ্টি আছে তার। আর আছে পরের উপকারের সদিচ্ছা।

নারায়ণ চায় মানুষ ভবিষ্যত ভাবুক। বর্তমান নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে ভবিষ্যতের দিকে মানুষ দৃষ্টি দিক।

গ্রামের খেটে খাওয়া মানুষ নারায়ণকে খুবই ভালবাসে। কারণ তাদের দুঃখে সে দাঁড়ায়। তাদের ন্যায্য অধিকার পাইয়ে দিতে সে তৎপর। জাত পাতের প্রশ্ন তার কাছে নেই। সকলেই সমান। সকলেরই অধিকার আছে পূজোয় একসঙ্গে অঞ্জলি দেওয়ার। হিংসার মধ্য দিয়ে নয়, ভালবাসার মধ্য দিয়েই সে উন্নতির পথ খোঁজে।

॥ চার ॥

সমস্যাসংকুল জীবন আর আশাহীন ভবিষ্যত নিয়ে রেবতী জীবন যাপন করতে থাকে। সংসার জীবনের প্রত্যেকটি ঘটনাতেই সে জীবনের দুঃখের সুর শোনে।

শৈলজা সরকারের কাছে এসে চোখের জলে বলে—দেখুন, একটো ব্যবস্থা করুন। একে আমার জ্বালা, তারপর আবার একটো জ্বালা এসে কাঁধে চাপল। আমার শরীর খসে খসে পড়ছে। আপনি গাঁয়ের হর্ত্তাকর্তা। আপনি না তাকালে কে আশ্রয় দেবে?

—শৈলজা, পৃথিবী বড় নিষ্ঠুর। বাদুরের চঞ্চুক্ষত ফলের মতো জীবন। কোন পরিত্রাণ নাই।

চোখের জলে শৈলজার গাল ভিজে যায়। কাপড়ের খুঁটে চোখ মুছে বলে—সরকার মশাই, তাহলে রেবুকে চোখের জল ফেলে পৃথিবী থেকে চলে যেতে হবে? আর আমাকে সেই দুঃখ সহ্য করে বাঁচতে হবে?

—শৈল, অধৈর্য হয়ো না। দেখ না কী হয়।

শৈলজা প্রণাম করে বলে—আমাদিকে একটু দেখবেন।

তারপর বাড়ী চলে আসে।

বেলা ১১টা। ত্রিভঙ্গ সরকার কাশতে কাশতে নারায়ণের বাড়ী যায়। হুঁকোয় একটা জোরে টান মেরে ধোঁয়াটা বার করে উড়ন্ত ধোঁয়ার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর ডাক দেয়—নারায়ণ, ও নারায়ণ।

নারায়ণের বাবা বিরক্ত হয়ে বেরিয়ে আসতেই দেখে সরকারকে—ও সরকার, হা। আমি মনে করেছিলাম কে কোথাকার। এস এস, বস ভাই।

—না-না-না, আমি বসব না। নারায়ণ আছে?

নারায়ণের বাবা ভিতরে ঢুকে গিয়ে ডাক দেয়।

—নারু আছিস, হা ?

নারায়ণ উপর থেকে নীচে নেমে এসে বলে—কি, বলছ কি ?

—ওরে তোকে কোন কাজ করতে বলি নি। দেখ, সরকার মশাই কি করতে ডাকছে।

—ও ....।

তাড়াতাড়ি বাইরে এসে বলে—কি ব্যাপার কাকা ?

—শুনছি তুই নাকি আজকাল গাঁয়ে দল পাকাচ্ছিস! দল পাকিয়ে গাঁয়ের উন্নতি করবি!

—সরকারকা, পৃথিবীর সবাই যদি ভালো হতো তবে মানুষের এতো কষ্ট হতো না। আমি কাকা খারাপের দলে, খারাপের সঙ্গ তৈরী করে তোমাদের গ্রামকে নষ্ট করতে চাই।

—কি রকম ?

—জানো, কালকের সদাইবাবুর কীর্তি ?

—শুনেছি। তবে বিষয়টি তলিয়ে দেখি নি।

—গাছের একটা ডাল কেটেছিল বলে অমলা বায়েনের বেটাকে যা মার দিয়েছে, বেটার ত্রিরিশ টাকা ডাক্তারী খরচ হলো। ঐ টাকা আমি বাড়ী থেকে চাল চুরি করে শোধ করেছি, তা জান ? আর এ বিষয়ে সদাইবাবুর সঙ্গে আমার ঝগড়া সৃষ্টি হয়।

সরকার বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর বলে- বেশ করেছিস। আজ তুই যেন আসরে যাস।

—আচ্ছা যাব। তবে এ ব্যাপারে নাকি ঢেরি পিটিয়েছে, আমাকে জব্দ করবে।

—তা করুক। বলে সরকার নারায়ণের গায়ে চাপড় মারে।

নারায়ণ বেশ উত্তেজিত হয়ে বলে—আমিও বিরাট দল গঠন করেছি। দেখা যাবে, হয় সদাইবাবু থাকবে—না হয় নারায়ণ।

সরকার আবার গায়ে চাপড় মেরে বলে-আঃ, অত উগ্র হোস না। তোর এখন অনেক কাজ বাকী। একটু চুপ করে থাকার পর বলে—সংসার বড় কঠিন। এর উপর দিয়ে নৌকা ডিঙিয়ে যাওয়া

আরও কঠিন। গরম বাষ্পের মতো গায়ে লাগে সংসারের পদধুলো। হাহাকার শুনবি মানুষের। জীবনে লাল আলো সংসারের পদযাত্রাকে বার বার করবে বিধ্বস্ত। তবুও চলতে হবে। তবেই তো বড় হতে পারবি। জানি, তোর সংকল্প বড় চমৎকার, কিন্তু বড় অপ্রিয়।

চোখের দিকে তাকিয়ে একটু মিচকি হাসে সরকার।

—হ্যাঁ কাকা, আমি দল গঠন করেছি। কারণ কি জান? কিছু লোকের অত্যাচার চরমে উঠেছে। আর একটা কি জান, আমাদের গ্রামে মহিলা সমিতি গঠন করা দরকার, তবে চরিত্র গঠন করে।

—তোর উদ্দেশ্য চমৎকার। পারবি তো?

পারব না কেন? তবে সকলের সহযোগিতা দরকার।

—হাঃ-হাঃ-হাঃ; আজ আসরে যাস।

– ঠিক আছে যাব।

সরকারের মুখে মৃদু হাসির রেখা ফুটে ওঠে। কিন্তু কোন কথা বলে না।

— সরকারকা তোমাকে পিছনে থাকতে হবে। গ্রামের যা অবস্থা তাতে মাথা তুলে না দাঁড়ালে গ্রাম শেষ হয়ে যাবে। মুখ বুজে শোনার দিন নয়। প্রাইমারী স্কুল, রাস্তা, দুর্গাবাড়ী এগুলির উন্নতি না করলে গ্রাম শেষ হয়ে যাবে।

—তোর যুক্তি তো মন্দ নয়। আমি তো অনেক চেষ্টা করেছি এবং করছিও। এখন আমার কাজ আর একটা বংশধর তৈরী করা। তোকেও তাই করতে হবে, যে পারবে তোর কাজ ধরে রাখতে।

ঠিকইতো।

—তবে মানুষ স্বার্থপর। তুই চাঁদা তুলবি, তোকে বলবে টাকা মারছিস। তাই মাঝে মাঝে মনে হয় গ্রামের রাস্তায় এক হাঁটু খাল করে দিই।

— ব্যাপার কি জান কাকা, একদল মানুষ আছে যাদের জীবনে অর্থ ই সব। অর্থের জন্য তারা নিজেদের ইজ্জত দিতে কুণ্ঠিত নয়। সুতরাং স্বার্থপররা যে মানুষকে বঞ্চিত করবে তা খুবই স্বাভাবিক।

—বিষয়টা বড়ই জটিল। এক দল শেখাচ্ছে আর এক দল শিখছে। স্বাধীনতার সময় বড় বড় নেতাদের এক পদক্ষেপে সারা ভারত উত্তাল হয়েছিল, আর এখন ?

— এর সমাধান কোথায় ? এর উৎপত্তির কারণ কি ?

— উৎপত্তির কারণ স্বার্থ। সমাধান নতুন যুগের সুচনায়।

—কি রকম ?

— আমি গান্ধীজীর পথ থেকে দূরে সরে এসে সুভাষকে আঁকড়ে ধরেছিলাম ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আনার জন্য। এসেছিল। পরিস্থিতির উপর দাঁড়িয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। তবেই হবে সমাধান। তার জন্যই দরকার Next Generation—Real Generation.

— কাকা তোমার অভিজ্ঞতা দারুণ।

—আমাদের বর্তমান সমাজের বুকে দাঁড়িয়ে আমি যে সিদ্ধান্ত নিয়েছি তা কতদূর কার্যকরী হবে বলা কঠিন। তবে তুই আমার ডান হাত। থাকবি তো আমার সঙ্গে ?

— চিরদিনই থাকব কাকা।

—ঠিক আছে, তুই আটটার সময় আসরে আয়। আমার গ্রামের ভিতরে একটু কাজ আছে।

— আমি একটা মিটিং ডেকেছি গ্রামে, দুপুরে। তুমি আসতে পারবে ?

– মনে হয় পারব না। তবে চেষ্টা করব।

সরকার চলে যায়। নারায়ণও আসে গ্রামের ভিতরে। সে মিটিং পরিচালনা করবে। গ্রাম্য সমস্যার উপর হবে আলোচনা। সমস্যা সংকুল গ্রাম্য সমাজের বুকে দাঁড়িয়ে নারায়ণ যে তরী ভাসাবে তা সমস্যা সমাধানের হাতিয়ার না হলেও প্রেরণা হবে। এ তার বিশ্বাস।

মিটিং শুরু হয় ঠিক তিনটেয়। সভাপতির আসনে বসে নারায়ণ। মিটিং-এর শ্রোতা অসংখ্য মানুষ। কারণ নারায়ণ বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় দুর্নীতির বুকে আঘাত হেনে স্পষ্ট করে বলতে পারে সব কথা। বর্তমান সমাজে যে জিনিসটা সবচেয়ে দুষ্প্রাপ্য সেটা হল সত্যবাদী লোক।

রাজনীতির শক্ত আবরণের মধ্যে যে জঘন্য রূপ লুকিয়ে আছে তা তুলে ধরার মতো বলিষ্ঠ লোকের অভাব। নারায়ণের কাজ সেই জঘন্য রূপকে তুলে ধরা। তাই বক্তৃতার শুরুতেই বলে —

গ্রামের কয়েকজন লোক গ্রামকে ধ্বংস করতে বসেছে। তারা আমাদের প্রতিনিধি। দলের কয়েকজনকে সামান্য কিছু ছিটিয়ে দিয়ে সবই গ্রাস করছে। এগিয়ে আসতে হবে বন্ধুগণ। আমাদের সরকারের দেওয়া অধিকারকে ছোট্ট একটা নিঃশ্বাসের মধ্যে উড়িয়ে দিলে চলবে না। যেমন ভাবে স্বাধীনতা সংগ্রামীরা নিঃস্বার্থভাবে লড়াই করেছিল, আমাদেরও সেই রকম লড়াই করতে হবে। সরকার কি আমাদের খারাপের জন্য আছে? কোন দিনই নয়। সুষ্ঠ বণ্টনের দায়িত্ব আমাদের। আমরা পারব না কেন, কেন? ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্য বিশাল স্বার্থকে কেন বিসর্জন দেব? না হলে শুধুই বঞ্চিত হতে হবে। এক দল মাতব্বর লোক ব্যক্তি-স্বার্থ পূরণে সর্বদা সচেষ্ট। লোককে ভুল বুঝিয়ে, অপরের উপর দোষ চাপিয়ে তারা এগিয়ে চলেছে। বন্ধুগণ! বুঝতে হবে, ভাবতে হবে, আমরা কি ভাবে আমাদের মৃত্যুর ফাঁদ তৈরী করছি। বিশাল ভারত সাম্রাজ্যে গ্রামের ভূমিকা যে কতখানি তা অনুমান করতে হবে। যারা আমাদের মাথায় পা দিয়ে নিজের আখের গোছানোর জন্য ব্যস্ত তাদেরকে চিহ্নিত করতে হবে। যেমন ধরুন, সমীর চ্যাটার্জী, মনোজবাবু এরা গ্রামের সর্বময় কর্তা। বহু টাকা পঞ্চায়েতের তছনছ করছে। কিন্তু সে টাকা তো আমাদেরই। আমাদের কাজ আমাদেরকে আদায় করে নিতে হবে। তারপর পশ্চিম বায়েন পাড়ায় চলছে মদের ভাটি। দেখুন তো, ওরা আমাদের কত সর্বনাশ করছে। ভাই-বোনেরা বুকে বল নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। স্পষ্ট করে মনের কথা বলতে হবে। তবে আমি এখন আর বেশী কিছু বলতে চাই না। আমার কাজই সব বলে দেবে।

নারায়ণ আর কোনো কথা না বলে সভা ভঙ্গ করে। জনমানসে বেশ একটা আলোড়ন ওঠে। নারায়ণের বক্তব্যকে সকলেই স্বাগত জানায়।

॥ পাঁচ ॥

সন্ধ্যা হয়ে আসে। গ্রামে নামে অন্ধকার। পাখিদের কিচির মিচির শব্দে গাছগুলি জেগে ওঠে। তারপর নিস্তব্ধ হতে থাকে বিক্রমপুর। ক্লান্ত পথিকের মতো বিক্রমপুর যেন গাছের তলায় ঘুমিয়ে পড়ে। কিন্তু ঘুমোয় না বটতলার আসর। রাত সাতটা বাজতেই প্রত্যেক দিনের অভ্যাস মতো সরকার মশাই একটি লণ্ঠন নিয়ে কাশতে কাশতে এসে উপস্থিত হয়। সোমাদীশ হালদার তাড়াতাড়ি চাটাইটা পেতে দেয়। সরকার বসে জিজ্ঞাসা করে—

—নারায়ণ আসে নাই ?

দোকানী ছুটে বাইরে এসে বলে—কি হে সরকার মশাই, ঐ ছোকরাদের দলে তুমিও ঢুকলে নাকি ? ঐ এক খরিশের ডাঁকা হল গাঁয়ে।

সমস্ত লোক হোঃ হোঃ করে হেসে ওঠে। বিরক্ত হয়ে সরকার সকলকে চুপ করতে বলে।

সরকার একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বলে—শৈল আসে নি ?

শৈলজা মাথার কাপড় টেনে চুপ করে দাঁড়িয়েছিল এক পাশে। তাড়াতাড়ি এসে উত্তর করে—এসেছি বাবা।

—ঠিক আছে। দাঁড়াও একটু, নারায়ণ আসুক।

'গুমরে গুমরে মরা' চোখের জল বইতে থাকে। শাড়ির উপরে মলিনতা বেশ স্পষ্ট। ব্যথায় ভরা ভগ্ন হৃদয়। মনে জ্বলন্ত আগুন। নেভানোর কোন জল নেই। মৃত্যুর কাছাকাছি আসতে চায় সে। তবে নিষ্ঠুর সমাজের কাছে তার 'অশ্রুসিক্ত' অভিযোগ বড় নির্মল।

শৈলজা এক পাশে চুপ করে বসে। কিছুক্ষণ পর নারায়ণ এবং প্রভাকর এসে উপস্থিত হয়। প্রভাকর নারায়ণের অন্তরঙ্গ বন্ধু। সরকার নারায়ণের দিকে তাকিয়ে বলে—আয়, আয় নারায়ণ, আয়। প্রভাকরকে হাত তুলে বসতে বলে।

আসরে বসে থাকা গ্রামের হর্তাকর্তারা কোন কথা বলে না। পাশে বসে থাকা নারায়ণ বাগ্দী তার চাটাইটা সরিয়ে দিয়ে নারায়ণকে বসতে বলে। আসর নিস্তব্ধ হয়ে যায়।

অন্ধকার ঘোর হয়ে আসে। চারদিকে শুধু অন্ধকার আর অন্ধকার। এই অন্ধকারের দিকে সরকার মশাই তাকিয়ে থাকে। তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে—একটা নারী আর্তনাদ করছে। এক দল মানুষ লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। তারা চায় ভোগের সামগ্রী করতে। নারীটি চায় না। কিন্তু তাকে বাধ্য করছে। বি-বস্ত্র হয়ে যাচ্ছে। দুটি হাত উপরের দিকে। পা দুটি নীচের দিকে। ছটফট করছে। কিন্তু বিবেক কোথায়—বিবেক ?

সরকার চোখের জল মোছে। হালদারের দিকে একবার তাকায়। তারপর নারায়ণের গায়ে হাত বুলিয়ে বলে—ভাল আছিস বাবা ?

—হ্যাঁ কাকা। স্পষ্ট উত্তর করে নারায়ণ।

—মহাভারতের দ্রৌপদীর কথা মনে পড়ছে রে।

—কেন কাকা ?

—দ্রৌপদী কি অসহায় ছিল ? না প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেছিল ?

—সে তুমি তো বেশী জানবে।

—আমার সব ভুল হচ্ছে।

তারপর চোখের পাতা ঘুরিয়ে শৈলর দিকে ফেলে—নারায়ণ, ঐ নারীটিকে দেখছিস ?

নারায়ণ তাকিয়ে অবাক হয়ে যায়। এক ঝলক আগুন যেন তার সমস্ত শরীরটাকে পুড়িয়ে দেয়। আর তারই ফলে সারা দেহের সমস্ত জল বাষ্প হয়ে বেরিয়ে আসে। নারায়ণ ঘেমে ওঠে।

—জানিস বাবা নারায়ণ, জীবনে বহু অন্যায় করেছি, মামলা মকদ্দমা করেছি অনেকের উপর। কিন্তু আর চোখের জল সহ্য হয় না।

শৈলজা কথাগুলো শুনে তাড়াতাড়ি নারায়ণের কাছে আসে—বাবা নারায়ণ, এ পোড়া কপালের দিকে কেউ ফিরে তাকাল না !

আসর এক পেশে হয়ে যাওয়ায় অনেকে বিরক্তি অনুভব করে।

অনেকের কৌতূহল বেড়ে যায়। কেউ কেউ শৈলজার দিকে করুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। কেউ কেউ নারায়ণের উপর লাল চোখ ফেলে।

নারায়ণ বলে—আমরা যখন আছি, তখন কোন না কোন একটা ব্যবস্থা করবই।

শৈলজা নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর সরকারকে প্রণাম করে বলে—সরকার মশাই, যা হয় করো, আমি চললাম।

তারপর চোখের জল মুছতে মুছতে পথ ধরে। নির্জন অন্ধকার পথ। আর নারায়ণ সেই পথের দিকে তাকিয়ে আলোর সন্ধান করে।

প্রভাকর তাড়াতাড়ি বলে ওঠে—নারায়ণ, চল আমরা একবার রেবুকে দেখে আসি।

সরকার তাড়াতাড়ি বলে—হ্যাঁ বাবা, তোরা একবার ওদের দুঃখের গভীরতাটা মেপে আয় তো।

সরকারের কথা শোনামাত্র দুজনে উঠে দাঁড়ায়। ঘোর অন্ধকার রাত। চাঁদ উঠতে বেশ দেরি। অনেক ঘুরে, একটা গলি রাস্তা দিয়ে পদ্মপুকুরের পাড়ে একটা ছোট্ট কোঠা বাড়িতে উপস্থিত হয় দুজনে। বাড়ির ভিতরে একটা লণ্ঠন জ্বলছে। বাড়ির চারদিকে কোন প্রাচীর নেই। দুজনে উঠানে দাঁড়িয়ে নির্বাক হয়ে যায়। ঘরের ভিতরে একটা লণ্ঠনের সামনে রেবতী অর্ধসান কেড়ে বসে আছে।

প্রভাকর নারায়ণকে আঙুলের খোঁচা মারে। নারায়ণ হাত ইশারা করে চুপ করতে বলে। প্রভাকর যেন তাড়াতাড়ি কিছু বলতে চায়। কিন্তু নারায়ণ রেবতীর দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। রেবতীর হৃদয় লণ্ঠনের তাপে দগ্ধ হয়ে যাবে। এত অল্প বয়সে সে জীবনে আনবে এক সঙ্গীহীন মুহূর্ত। ব্যথায় ভরে যাওয়া প্রাণ রুদ্ধ করেছে বাক্‌, নিশ্চল হয়েছে গতি শক্তি।

প্রভাকর জোরে বলে ওঠে—কতক্ষণ থাকবি, কিছু বল, না হয় চল।

এই কথাগুলি রেবতীর কানে পৌঁছাতেই ফিরে তাকায়। তার

বুক ঠুই ঠুই করে ওঠে।

শৈল তাড়াতাড়ি উঠে আসে—কে গো - কে গো ?

নারায়ণ কাছে গিয়ে বলে—আমি নারায়ণ।

—ও, এস বাবা, এস, এস। রেবতী, তাড়াতাড়ি লণ্ঠনটি বার কর মা। আর ঐ চট ছেঁড়াটো নিয়ে আয়।

রেবতী লজ্জায় ঘরের কোণে ঢুকে যায়।

নারায়ণ তাড়াতাড়ি বলে ওঠে—থাক্ থাক্, আমরা এখানেই বসছি।

—না বাবা, তাই কি হয়। বলে ঘরের মধ্যে ঢুকে রেবতীকে ধমক দেয়।

প্রভাকর বলে—শৈল পিসি, রেবতীকে একবার ডেকে দাও না।

শৈলজা রেবতীকে আসতে বললেও সে আসে না। অতল সমুদ্র বক্ষে যেমন পিপীলিকা পড়লে ভেসে চলে, তারপর জীবনে আসে অন্ধকার। রেবতীও তেমনি ভাসতে থাকে। জীবনের 'অন্তিমবার্তা' মুহূর্তে তার কাছে দৈত্যের রূপ ধারণ করে দাঁড়ায়।

বেশ কিছুক্ষণ পর শৈল ঘরের ভিতরে ঢুকে যায়। রেবতীকে ভৎর্সনা করে হাতে ধরে টেনে বার করে নিয়ে আসে।

ভ্রূ কুঁচকে প্রভাকর জিজ্ঞাসা করে—তোমার বয়স কত ?

রেবতী উত্তর দেয় না। শৈলজা রেবতীকে ধমক দিয়ে বলে—১৭-১৮ হবে।

—আচ্ছা তোমাকে ছেড়ে দেওয়ার কারণ কী ?

মায়ের ধমকানিতে রেবতী মরিয়া হয়ে বলে—আমার কলঙ্ক আছে।

নারায়ণ চুপ করে রেবতীর দিকে তাকিয়ে থাকে। কলঙ্কের আল্পনা শুধু নারী জীবনে এঁকে দিলেই সে চির অপবিত্র ! ধন্য সমাজ ! ব্যথার আগুন জ্বালিয়ে দিতে পারলে এই সমাজ আনন্দ বোধ করে।

প্রভাকর মাথা নিচু করে বসেছিল। মুখ তুলে বলল—তুমি কলঙ্কিতা !

নারায়ণ থাকতে না পেরে বলে—রেবতী !

রেবতী চমকে ওঠে—নারায়ণদা !

—রেবতী তুই চিন্তা করিস না। আমরা তো গ্রামে আছি।

কথাগুলি বলে নারায়ণ প্রভাকরের সঙ্গে আসরে ফেরে।

এদিকে রাত বেশ হয়েছে। সমস্ত লোক চলে গিয়েছে। মুদিখানা বন্ধ হয়ে গেছে। শুধুমাত্র একটা লোকই বসে আছে চাটাই-এর উপর।

নারায়ণ ও প্রভাকর ফিরিবামাত্র জিজ্ঞাসা করে—কি হল বাবা ?

প্রভাকর উত্তর দেয়—পরিস্থিতি বড় শোচনীয়।

নারায়ণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে।

গ্রামের মধ্যে নিস্তব্ধতা নেমে এসেছে। কেবল মাত্র তিনটি জীব সেই নিস্তব্ধতার মধ্যে ক্ষণিক আলোড়ন সৃষ্টি করে আপন আপন ঘরে ফেরে।

রাত বেড়ে চলে। বেয়ে চলে দুঃখের নৌকা রেবতীর জীবনে। সংসার জীবনে এক সজ্জাহীন সন্ধ্যা নেমে এসেছে তার জীবনে। গ্রামের অনেক লোক যায় রেবুদের বাড়ী। নানান কথায় সান্ত্বনা দেয়। কিন্তু ......। জীবনে বিপর্যয় আসে। সেই বিপর্যয়কে পদাঘাতে সরিয়ে দিয়ে যে খাড়া হয়ে দাঁড়াতে পারে সেই তো মানুষ। কিন্তু দাঁড়াবার মতো শক্ত মেরুদণ্ড রেবতী বা শৈলজার নেই। কি করে হবে। যারা তাদের সান্ত্বনা দিতে আসে তাদের উদ্দেশ্য বড় নিষ্ঠুর। হালদার প্রত্যহ সন্ধ্যায় শৈলজার বাড়ী যায়। রেবতীর প্রতি তার লোলুপ দৃষ্টি।

সেদিন সন্ধ্যায় শৈলজা গ্রামের ভিতরে যায় রাতের খাবার জোগাড় করার জন্য। শৈলজার যাওয়ার সুযোগে হালদার এসে উপস্থিত। রেবতী দেখে লজ্জায় ঘরের ভিতরে ঢুকে যায়।

হালদার শৈলজাকে উদ্দেশ্য করে বলে—শৈলদি বাড়িতে আছ ?

কিন্তু উত্তর আসে না। তাই আবার ডাকে—রেবতী, ও রেবতী।

রেবতী মিহি সুরে উত্তরে বলে—বসুন।

—ও, বাড়িতে আছিস অথচ কথা বলছিস না। তোর মা কোথা গেল ?

—গ্রামের ভিতর।

—কি করতে রে ?

—চাল কিনতে।

—কেন আমার বাড়ি পাঠিয়ে দিলি না ?

—কি করে জানব বলুন।

লজ্জায় রেবতীর চোখ দুটো কুঁচকে যায়। কিন্তু গ্রামের নামী লোক, বাড়ীতে এসেছে, তাই কথা বলতে বাধ্য হয়েছে।

হালদার বলল—রেবু শোন।

রেবতী লজ্জা সম্বরণ করে কাছে আসে।

—আচ্ছা রেবতী, তোর স্বামী তোর প্রতি বিরূপ হল কেন ?

—সে পুরনো কথা আমি আর বলতে পারব না।

—না-না-না ; তোর দুঃখ হচ্ছে বুঝতে পারছি। তোকে যদি আবার সেখানে নিয়ে যায় ?

—আমি আর যাব না। বলে চোখের জল মুছল।

—রেবু, কাঁদিস না। শোন, তোদের বাড়ি নারায়ণ এসেছিল ?

—এসেছিল।

—তোকে কিছু বলছিল নাকি ? সাবধান খুব খারাপ ছেলে।

—খারাপের তো কিছু বুঝলাম না।

হালদার চুপ হয়ে যায়। রেবতী ঘরের ভিতরে যেতে থাকলে সে ডাকে—রেবতী শোন।

—কি বলুন।

—বাবা! তোদের বাড়ি এলাম বলে গরম দেখাচ্ছিস ? তোকে বার বার বলছি শোন, নারায়ণ থেকে সাবধান।

—আমাদের আর সাবধান-অসাবধানের কি আছে বলুন।

—বলছি কি জানিস, ছেলেটি খুবই অসৎ।

—অসৎ মানে? আমাকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেবে? সে বড় ভাল।

—না, তোকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলবে।

রেবতী আঁতকে ওঠে—কি বলছেন আপনি! তার চোখের চাউনিতে দেখেছি হৃদয় আছে।

—রেবতী তুই বুঝিস না। ওকে খবরদার আসতে দিবি না।

—আমি পারব না।

—না পারলে..........

কথা শেষ না হতেই শৈলজা ঘরে ঢোকে। হালদারের কথা বন্ধ হয়ে যায়। শৈলজা জিজ্ঞাসা করে—কি হালদার মশাই, কখন এলেন?

—এই তো একটু আগে।

শৈলজা চালের পুঁটলিটা নামিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকাতে বলে। এদিকে হালদারও বসতে বলে রাস্তা ধরে।

শৈলজা আড় চোখে একবার দেখে।

॥ ছয় ॥

এক পশলা বৃষ্টি হয়ে যাওয়ার পর আকাশটা পরিষ্কার হয়ে যায়। বাতাসও হয় বন্ধ। বেলা দশটা এগারটা হবে। নারায়ণ বাড়ি থেকে বের হয় ক্লাবের দিকে। গ্রামের মস্তান। তবে গ্রামের অধিকাংশ লোকই তাকে ভালবাসে। কারণ নারায়ণও ভালবাসে গ্রামকে, গ্রামের মানুষকে। নারায়ণ ক্লাবে প্রভাকরকে থাকতে বলে রেবতীদের বাড়ীর দিকে হাঁটতে শুরু করে। তার মুখে মাঝে মাঝে লজ্জার রেখা ফুটে উঠতে থাকে। সে রেবতীর অন্তর্বীণায় গুমরে ওঠা কান্না শুনতে পায়। তাই সে রেবতীকে এক নতুন জীবনের সংকেত

দেওয়ার জন্য হয় অগ্রসর। অবশেষে রেবতীর বাড়ী পৌঁছায়।

শৈলজা গৃহের কাজ ফেলে তাড়াতাড়ি একটা চাটাই পেতে বসতে বলে। রেবতী ঘরের ভিতর হতে নায়ায়ণের গলা শুনে বেরিয়ে আসে। রেবতীর প্রতি দৃষ্টি যায় নারায়ণের। নারায়ণ দেখতে পায় এক ক্রন্দনরত নারীকে। সে ব্যথার শেষহীন সাগরে পড়ে দিশেহারা।

নারায়ণ জিজ্ঞাসা করে—রেবু, ভাল আছিস তো?

উত্তরে রেবতী বলে—ভাল থাকা কি আমার সম্ভব?

শৈলজার গভীর দুঃখ রাগের সঙ্গে প্রকাশ পায়—পোড়া কপাল নিয়ে তো নিজে জ্বললো, আমার জীবনটাকেও জ্বালিয়ে দিল।---- নারায়ণের একটু কাছে এসে হাতটা মুখের কাছে নিয়ে গিয়ে বলে—দেখ বাবা, আজ আমাকে পরের ঘরে কাজ করে এই লক্ষ্মীছাড়ীকে পুষতে হয়।

রেবতী চোখের জল ধরে রাখতে অসমর্থ হয়। বসুমতীর দিকে তাকিয়ে বিশাল খালের সন্ধান করে। যেখানে চির শান্তি পেয়েছিল সীতা।

নারায়ণ শৈলর দিকে তাকিয়ে বলে—শৈল পিসি, তুমি একটু চুপ কর তো।

গ্রামের মানুষের প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের একটা মৌখিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। তাই নারায়ণের সঙ্গে শৈলর সম্পর্কটা ঐ রকম।

শৈলজা নারায়ণকে বসতে বলে কাজে চলে যায়। নারায়ণ জানে সে রাখহরি ঘোষের বাড়িতে ঝি-গিন্নি করে। ধান সিদ্ধের কাজ করে।

কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকার পর নারায়ণ বলে—রেবু, তোর মাকে কালকে সরকারকার সঙ্গে দেখা করতে বলিস।

—কোন কিছু বলবে?

—এমনি দেখা করতে বলিস।

—আচ্ছা বলব।

রেবতী চুপ করে যায়। তার মুখটা লাল হয়ে ওঠে।

—কি চিন্তা করছিস?

—জান, কালকে হালদার এসেছিল এবং তোমার দারুণ দোষ দিছিল। এমন কি তোমাকে এখানে আসতে নিষেধ করেছে।

—রেবতী, তুই কি মনে করিস আমি এখানে কোন উদ্দেশ্য নিয়ে আসি? হালদারের মন বড় কঠিন। কালকে আসরে এ নিয়ে ঝড় ওঠে। সরকারকা সকলকে চুপ করায়।

হঠাৎ রেবতীর চোখের দিকে তাকায়—রেবতী, আমার জীবনের দুঃখ তোর চেয়ে বেশী রে।

—নারায়ণদা, আমি তো তোমার দোষ দিই নি, তাতে হালদার আমার প্রতি রুষ্ট হয়। আমি কি ওদের খেলার পুতুল হব?....

—রেবতী, আমি যতক্ষণ এই গ্রামে আছি ততক্ষণ তোর ওপর কোন লোকের অত্যাচার সহ্য করব না। তবে তুই যেন ঠিক থাকিস।

—এতেই তো প্রতিবেশীরা গুন্ গুন্ শুরু করেছে। নারায়ণদা, দুঃখ কি চিরকালই থাকবে? ভালবাসা কি কোন দিনই পাব না?

নারায়ণ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে কিছুক্ষণ ধরে রেবতীর দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর বলে—রেবতী, সবাই তোকে ধিক্কার দিচ্ছে। কেউ কি তোর পাশে এসে দাঁড়াচ্ছে?

রেবতীর চোখে জল আসে।

নারায়ণ বলে—চোখের জল ফেলে কি সুখ পাবি? তোর চোখের জল শেষ হয়ে গেলেও কেউ তোর দুঃখের ভাগী হবে না। শুধু সান্ত্বনা দেবে। হৃদয় দেবে না।

—নারায়ণদা, তুমি তো আমার থেকে অনেক বড়। তাই তুমি যতটা বোঝ আমি ততটা বুঝি না।

নারায়ণ বেশ কিছুক্ষণ রেবতীর দিকে তাকিয়ে থাকার পর একটা ঢোক গিলে বলে—তোকেও বুঝতে হবে....।

—আমি কী বুঝব? জান, তুমি যখন চলে যাবে তখন পাশের বাড়ীর মেয়েদের ফুস্-ফুস্, গুজ-গুজ শুরু হবে। শুধু ধিক্কার—"শয়তানী স্বামীর ভাত ছেড়ে গাঁয়ে যা মন তাই করছে।"

—তোকে ওদের কথায় কান দিলে চলবে না। ওরা অনেক কিছু

বলবে। আচ্ছা, ওদের পাশের বাড়ীর মনসাদা কিছু বলছিল নাকি? ও আসরে আমার সম্পর্কে অনেক কিছু বলেছে।

—মনসাকা এক নম্বরের খচ্চর। ওর বৌ আমাকে কালকে কি গাল দিয়েছে, যা বলা যায় না। অবশ্য মা ওকে দু একটো কথা শুনিয়ে দিয়েছে।

—আমরা অসহায়, তাই কাকে গু এনে দিছে।

তুবড়ীতে আগুন লাগালে যেমন চারদিক আলোকময় হয়, তারপর ঘোর অন্ধকার ডেকে আনে। নারায়ণও তেমনি গর্জন করে কি যেন বলতে গিয়ে নরম হয়ে যায়। তার কয়েক ফোঁটা চোখের জল মাটিতে পড়ে।

রেবতী নারায়ণের চোখের জল দেখে হাঁপিয়ে ওঠে। এক নীরবতার ঢেউ খেলে যায়।

কিছুক্ষণ পর নারায়ণ বলে—এক কাজ করতে পারবি?

—কি কাজ?

—পারবি কি?

-পারাপারি পরের কথা। কাজটা আগে বল তো!

—তুই কালকে একবার আসরে যাস, কিছু কথা আছে। সরকারকা থাকবে।·· হ্যাঁ, আর একটা কথা৷' তুই হয়ত শুনেছিস দেবকীর স্বামীর খুব অসুখ।

—না তো!····আচ্ছা, ওব বিয়ে কোথা হয়েছিল?

—ক্যানে, কত কাণ্ড হয়ে গেল ওর বিয়েতে····।

সংসার জীবনে ক্ষত-বিক্ষত রেবতী। তাই তার একমাত্র চিন্তা ফেলে আসা জীবনের লাঞ্ছনায়। যাতে সে সব ভুলতে বসেছে। তপ্ত বালি যেমন গায়ে লাগলে তিক্ত বেদনার আভাষ পাওয়া যায়, রেবতীরও নারায়ণের কথা শুনে, ফেলে আসা জীবনের কথা মনে পড়ে তিক্ত বেদনা সঞ্চারিত হয়। দেবকীর বিয়ের কথা তার উদাসীনতায় যেন ঢাকা পড়ে গিয়েছে।

—জান নারায়ণদা; দেবকী আমার প্রাইমারীর বন্ধু।

—দেবকী হয়ত বিধবা হবে। ওর স্বামী ক্যান্সারে ভুগছে, মৃত্যু আসন্ন।

—আচ্ছা, দেবকীর প্রতি তোমার এত দরদ কেন?

নারায়ণ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে—একে দেবকী আমার পাড়ার মেয়ে। তারপর ওর বাবা বিয়ের সময় অনেক কাকুতি-মিনতি করেছিল, আমার বন্ধু বিপ্লবের সঙ্গে বিয়ের ব্যবস্থা করে দেওয়ার জন্য। কিন্তু বিপ্লবের মত থাকলেও ওর বাবা মাথা নোয়ায় নি।

—তারপর কি হল?

—চোখের জলে বুক ভাসিয়ে আমাদের পাড়া থেকে বিদায় নিতে হল এক বৃদ্ধের সঙ্গে, অর্থের অভাবে।

—মনে পড়েছে, বিদায়ের সময় আমি ছিলাম। অনেক বুঝিয়েও ওর চোখের জল মোছাতে পারি নি। তবে বিপ্লবের ব্যাপারটা জানতাম না।

—বিদায় বেলায় আসতে পারি নি। বিপ্লব এবং আমি এক জায়গায় ছিলাম।

—আচ্ছা নারায়ণদা, বিপ্লবদার কি উচিত ছিল না ওকে উদ্ধার করা?

—বিপ্লব আমাদের সংস্কার ভাঙতে পেরেও পারে নি। বাবার ঘোর আপত্তিতে সে ঐ বিয়েতে অসেতে পারে নি।

—বিপ্লবদা যদি জাত না দেখে একটা মেয়ের জীবনে হাসি ফুটাতে পারত, তবে সত্যই সে ভাল কাজ করত। ঈশ্বরের কাছে চির পরিচিত হয়ে থাকত।

—সমস্ত বুঝেও বিপ্লব আসতে পারে নি। সে দেবকীর জন্য চোখের জল ফেলেছে, সারা রাত সে জেগেছিল, কেবল উঠেছে আর বসেছে। বাবার ভয়ে সংস্কার ভাঙতে পারে নি।

—ওর স্বাধীনতা নাই?

—নিশ্চয় আছে। কিন্তু ও তখন পড়ছিল। হোস্টেলে থাকত। বাবা টাকা বন্ধ করে দেবে বলে ভয়ে বিয়ে করে নি।

—আজ যদি দেবু আমার মত হয়ে দাঁড়ায়, বিপ্লবদা ভুরু কুঁচকে দাঁড়াবে। মেয়েদের উচিত মেয়েদের আদর্শ ঠিক রাখা।

—কিন্তু সবাই কি তাই পারবে?

—পারবে না জানি। কিন্তু পারা উচিত।

—যাক, কালকে তুই যেন আসরে যাস।

—আমি কি ওই বড়দের মজলিসে যেতে পারি? এ অসম্ভব!

—অসম্ভবকে সম্ভব করতে হবে। উচিত অনুচিতের ধার ধারলে হবে না। তোকে তো অনেকে কলঙ্ক লেপে দিয়েছে, বল্, তোর পাশে কে দাঁড়িয়েছে?

—নারায়ণদা!

—রেবতী, তুই লজ্জা সংকোচ খুলে ফেল। মরিয়া হয়ে নেমে পড়্ আমার সঙ্গে গ্রাম গঠনে। না হলে জীবনটা শুকিয়ে শেষ হয়ে যাবে।

—নারায়ণদা, ভগবান যা কপালে দিয়েছে তাই হবে।

রেবতীর সমাজের একটা বাঁধ ডিঙিয়ে আসতে বেশ ভয়। সংসার-সংগ্রাম তার সামনে একটা বিরাট বিপর্যয়। রেবতী আকাশের দিকে তাকায়। তার চোখ দুটি বন্ধ হয়ে আসে, চোখের ফাঁক দিয়ে জলের ধারা গড়িয়ে আসে। মনে পড়ে ফেলে আসা জীবনের কথা। পরিত্রাণ! লোকালয়ে আসতে সে লজ্জা অনুভব করে। ধিক্কারের মালা পড়তে হবে। রেবতীর সামনে ভেসে ওঠে কতগুলো বিশাল চোখ। শুনতে পায় খিল খিল হাসি।

নারায়ণ আবার বলে—কালকে তুই আসরে যাস। আমার পাশে একটু বসবি, তারপর চলে আসবি।

নারায়ণ চলে আসে। রেবতী চুপ করে বসে থাকে। তার চোখ স্থির। চিন্তায় মগ্ন। তার মুখ হতে বেরিয়ে আসে—নারায়ণদার পাশে বসব ··নারায়ণদা····

ক্ষত-বিক্ষত নারী, পল্লীবাসীদের হেয় পাত্রী। তাই তার গভীর চিন্তা। মজলিসে কি করে যাবে? একবার ওখানে গেলে আর

দাঁড়াবার জায়গা নেই। সে চিন্তা করে—তাকে তো সমাজ করে থাকতে হবে। যদি স্বামীর কাছে গিয়ে মাথা গুঁজে থাকে তা কি অপরাধ? তাড়িয়ে দিয়েছে রাগে। সে রাগ পড়ে নি কি? সে ওইখানেই যেতে চায়। আবার চিন্তা করে—নারায়ণকে কথা দিয়েছে।

পরিত্রাণের পথ খোঁজে। শেষ মরণের উপকূল হতে পারে না। ধ্বংসই পরিত্রাণ নয়। সংগ্রামের মধ্য দিয়ে সত্যিকারের মানুষ সৃষ্টিই পরিত্রাণ। তাই রেবতী নিজেকে শক্ত করে। সে মনকে বোঝায়। সে ভাবে—তার দুঃখ সকলকে শোনাতে হবে। আসর মানেই আদান প্রদান। বিজ্ঞাপন প্লেট। তাই সে যাওয়া প্রয়োজন মনে করে। রেবতী হতাশার গর্ভ থেকে আশার সাগরে পা বাড়ায়।

শৈল ঘরে প্রবেশ করে। ঘরে ঢুকে বলে—দে মা রেবু, আঁচ দিয়ে দে। বসে বসে দুঃখ করে কি করবি বল।

রেবতী নিজেকে কিছুটা শক্ত করে উনোন ধরাতে যায়। ঘুঁটে আর কতগুলো কাঠ ভাঙা দিয়ে উনোন ধরাতে বসে এক অব্যক্ত বেদনায় সে আঁৎকে ওঠে। এক প্রকাণ্ড শক্তি তাকে দুর্বল করে দেয়। সে বারে বারে উনোন ধরাতে ব্যর্থ হয়। তাকে বারে বারে ব্যর্থ হতে দেখে শৈলজা তার চুলের মুঠো ধরে ধমক দিয়ে সরিয়ে আনে—মুখ-পুড়ির কোন ক্ষমতা নাই। মার রক্ত চুষে চুষে খেছিস, লজ্জা লাগে না।

রেবতী ফুপিয়ে কেঁদে ওঠে। তার পতোন্মুখ চোখের জলে সারা বিশ্ব অন্ধকার হয়ে যায়। এই বিশ্ব তার কাছে ছায়ার মত মনে হয়। রেবতী ঘরের বাইরে চলে আসে। দুঃখ-তপ্ত হৃদয়ে এক গভীর ব্যথার সঞ্চার হয়।

তাদের বাড়ির সামনের বাঁশগুলো নুঁইয়ে পড়েছে। রেবতী সে-গুলোর দিকে কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। একদিকে সংশয় অন্যদিকে জীবন সংগ্রামে জয়ী হবার প্রচণ্ড আন্দোলন শুরু হয়

রেবতীর মনে। রেবতী সমাজকে বুঝতে থাকে। পাশের বাড়ির মানুষগুলোর গুন্-গুন্ শব্দের ধিক্কার তার কানে আসবে। একেই সত্যের পথে চলে যদি বহু কথা শুনতে হয় তবে আসরে এসে পুরুষদের সঙ্গে আলোচনায় অংশ নিলে তো আর নিস্তার নেই। আগুন জ্বললে ধু-ধু করে উপরে উঠতে থাকে। কিন্তু তার মাঝে জলের ছিটা দিলে তার প্রচণ্ড শক্তির কিছুটা স্তিমিত হয়ে যায়। আবার ইন্ধন থাকলে নিজের শক্তি কিছুটা প্রকাশ ঘটে। তাই রেবতীর মনে সংশয়ের ছিটা পড়লেও তার মধ্যে জ্বালানীর অভাব নেই। সে জ্বলতে চায়।

অবশেষে সে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হয়। আসরে গিয়ে মনের কথা খুলে বলবে। কিন্তু তার মুখ ম্লান হয়ে যায়। তার ম্লান মুখের সীমাহীন দুঃখের প্রতিচ্ছবি প্রত্যেকটি বাঁশ গাছের ফাঁকে ফাঁকে ফুটে ওঠে।

হঠাৎ শৈলজার ডাক আসে—রেবু, ও রেবু, খেয়ে যা মা।

রেবতী গম্ভীর ভাবে উত্তর দেয়,—যাব না।

—আয় মা, আর জ্বালাস না, খেয়ে যা।

—আমি খাব না। আমার খিদা নাই।

—সারাদিন তো কিছু খাস নি—আয়, তাড়াতাড়ি খেয়ে যা।

রেবতীর জীবনের ভীষণ আক্ষেপ তীব্র বাণের মতো প্রকাশিত হয়—জীবনটো শেষ হয়ে গেল।

প্রচণ্ড ভাবে আঘাত-প্রাপ্ত মানুষ যখন সেই আঘাত লাঘব করার উপযুক্ত পথ পায় না, তখন তার হৃদয়ে এক নিঃসম অন্ধকার সৃষ্টি হয়। আর সেই অন্ধকার দূর করার জন্য মানুষ নানা রকম সান্ত্বনা সৃষ্টি করে নিজের হৃদয়ে। অনেক সময় মানুষের সান্ত্বনাই জয়ী হয়। কিন্তু রেবতীর সান্ত্বনা কোথায়? আসরে গিয়ে নিজের শত শত দুঃখ প্রকাশ করায়, না গৃহকোণে প্রতিবেশীদের শাসনে আবদ্ধ থাকায়? সে দুই তীরে পা দিয়ে অন্ধকার দেখে।

শৈলজা আবার ডাকে—রেবু, তোর খিদে লাগে নি?

তার সে ক্ষুধা তো পেটের ক্ষুধা নয়। তার ক্ষুধা বঞ্চিত জীবন

হতে স্বাভাবিক জীবনে আসার ক্ষুধা।

রেবতী মায়ের আকুতিতে খেতে যায়। ভাতের কয়েকটি গ্রাস তোলার পর তার অন্তরের কান্না গুমরে ওঠে। রেবতী লণ্ঠন নিয়ে মুখ ধুতে ঘাটে যায়।

তখন রেবতীর অন্তরে একটা কথাই বাজতে থাকে—নারায়ণকে সে কথা দিয়েছে। না গেলে কথা খেলাপ হবে।

কিন্তু তার চিন্তা ঘুমানোর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত শেষ হয় না। সে মাঝে মাঝে হতাশ হয়ে পড়ে। তার চিন্তা আগর ভেঙে দুধার হয়ে ওঠে না। তার মধ্যে একটা বিষন্নতার আভা ফুটে ওঠে, যা হয়ত ফেলে আসা জীবনের নিদর্শন। কারণ শৈল দীর্ঘ ব্যথা উপশমের দামামা বাজাতে পারে নি। সে অবশ্য দুঃখের ভাগ নিয়েছে। রেবতী রাতের অন্ধকারের সঙ্গে লড়াই শুরু করে নির্মল সকাল আনার জন্য। অন্ধকার সরতে থাকে।

॥ সাত ॥

বেশ কিছুক্ষণ প্রখর রোদের পর খণ্ড খণ্ড মেঘে আকাশ ঢাকা পড়ে যাওয়ায় রোদের প্রচণ্ড কিরণে কিছুটা বাধা পড়ে। ফলে শীতলতার আভাষ পাওয়া যায়।

ত্রিভঙ্গ সরকার বাড়ীর উঠোনে বসে রামায়ণের পাতা উলটাচ্ছে। বাড়ী সুদ্ধ লোক খাওয়ার পর ঘুমের কোলে আশ্রয় নিয়েছে। সরকার দুপুরে ঘুমোয় কম, কারণ তার বুক জ্বালা করে।

বেশ কিছুক্ষণ পর বইটা নামিয়ে গড়গড়াতে টান দেয়। এটা তার চিরদিনের অভ্যাস। ইত্যবসরে নারায়ণ এসে উপস্থিত হয়।

—কিরে নারায়ণ, কি খবর?

—সরকারকা, তোমার সঙ্গে দরকার আছে।

—কি এমন দরকার ?

মেঘে ঢাকা সূর্য আবার প্রচণ্ড তেজ নিয়ে দেখা দেয়। মেঘছায়া দিন।

—কাকা, আজ বটতলার আসরে যাবে তো ?

—আসরের সঙ্গে আমার হৃদয়ের সম্পর্ক। সেখানে না গেলে কি হয় ? তবে শরীর খারাপ থাকলে যেতে পারি না। অবশ্য আমি না গেলে আসর জমে না।

—আসর তো তোমারই জন্যে।

—কি জানিস, সময়টা বেশ কাটে। পাঁচজন পাঁচ কথা বলে, বেশ ভালোই লাগে।

—কাকা, আজকে তুমি অবশ্যই যাবে। রেবতী আসবে।

—রেবুকে তুই নিয়ে আসবি ! রেবু আসবে ! রেবতীকে না আনলে সমাজে সে পতিতা হয়ে পড়ে থাকবে। পাড়া প্রতিবেশীরা আনাগোনা শুরু করেছে। এতে মনে হয় মেয়েটি অনেক অন্ধকারে চলে যাবে। কিন্তু সে আসবে ?

—আমি গিয়েছিলাম। বুঝিয়ে-সুঝিয়ে তাকে রাজী করেছি।

সমাজ বন্ধন। মাকড়সা জাল বুনে নিজেই জালে আঁটকা পড়ে। আমাদের সমাজের ব্যবস্থাও ঠিক তাই। আমরা আমাদের সুবিধার জন্য সংস্কার সৃষ্টি করেই আমরা ক্ষত-বিক্ষত। মানুষের দ্বারা মানুষকে আঘাত, ভাবতে কষ্ট হয়। অপরকে উসকানি দিয়ে সরে পড়ার গ্রাম্য রাজনীতি। ত্রিভঙ্গ সরকার এই গ্রাম্য রাজনীতির সঙ্গে খুবই পরিচিত। সরকার জানে—মানুষ নিজের জন্য যতটা তৎপর অপরের জন্য অতটা হলে মানুষের দুঃখ অনেক দূরে চলে যেত।

নারায়ণের কথা শুনে সরকার অবাক হয়ে যায়। বলে—আচ্ছা নারায়ণ, রেবতী আসবে তুই ঠিক বলছিস ?

—সে তো বললো যাব।

—চারদিকের মানুষগুলো তোদের কথা শোনে নি ? ঐ লজ্জাশীলা

নারীটি তোর সঙ্গে মন দিয়ে কথা কইল? আমাকে খুবই সমীহ করে রে।

—জানো কাকা, মানুষের জীবনে বিপর্যয় এলে অন্তত একবারও তাকে মরিয়া হয়ে দাঁড়ানো উচিত। রেবতীরও এ কথা বোঝা উচিত।

—রেবতী বুঝতে পারছে না?

—কই? তবে বোঝানোর আপ্রাণ চেষ্টা করছি।

—সেটা তোর কর্তব্য। যে যা বলার বলুক, এগিয়ে চল তো। আমাদের একটা ছোট্ট সেন্টিমেণ্ট আমাদের সব—সব শেষ করে দিছে।

—কাকা, আমি একটা কথা বলছিলাম কি জান, আমরা যদি ওর সম্মতি নিয়ে একটা চিঠি দিই ওর স্বামীকে?

—খুব ভাল হয়, বাবা। ওর সম্মতি-টম্মতি নয়। চিঠি রেবতীই দেবে, তুই শুধু পরামর্শ দিবি।

একথা বলে সরকার মশাই গড়গড়ায় টান দিল।

—তারপর আমার কাজ হবে ওকে বৃহত্তর সমাজে তুলে আনা।

—তুই পারবি? ও কি আসবে?

—দেখি না।

সরকার উত্তর দেয় না। রামায়ণটার দিকে তাকিয়ে থাকে এক দৃষ্টিতে।

কিছুক্ষণ পর বলে—পারলে ভালোই হয়। গ্রাম্য রাজনীতি বড় জঘন্য। তার চেয়ে বৃহত্তর গণ্ডীতে এলে মনের পরিবর্তন হয়। বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হয়, যাতে মানুষের মনের বিকাশ ঘটে।

নারায়ণ আর কোনো কথা না বলে সরকারকে বসতে বলে চলে যায়।

সরকার ভাবতে শুরু করে:

এই সংসার রহস্যময়। গ্রাম-বাংলায় মানুষ শুধু অর্থনৈতিক সমস্যায় মগ্ন নয়, গ্রাম্য জীবনে যে দুটি রাজনীতি চলছে, তা বড় ভয়াবহ। মানুষের আদর্শ হয়ত ঠিক থাকে না, কিন্তু মানুষের জীবনের

দাম কখনো কি কমে? মানুষ আজ সমাজ-ব্যবস্থাকে যে ভাবে ক্ষত-বিক্ষত করছে এর পরিণাম যে কত নির্মম তা কে জানে? আর জেনেও মানুষ পাপ করছে। মানুষ জ্ঞানপাপী।

সরকার আকাশের দিকে তাকায়। তারপর রামায়ণটা খুলে পুনরায় বন্ধ করে:

রামচন্দ্র রাজনীতির আশ্রয় নিয়ে লঙ্কা ধ্বংস করেছে। উদারচেতা রাবণ নিজের জীবন অঞ্জলি দিয়েছে মায়ের কাছে। ওঃ, কি ত্যাগ!

রোদ চিট চিট করে লাগতে থাকলে সরকার ঘরের মধ্যে ঢুকে যায়। তারপর বসে বসে ঘড়ি দেখে।

এদিকে নারায়ণও বাড়ী ফেরে। বাড়ীর সকলে তাকে তাচ্ছিল্য করে। কিন্তু সে সেদিকে ভ্রূক্ষেপহীন। তার জীবনে একটাই স্বপ্ন—পরিবর্তন। অবশ্য তার বাড়ীর লোকেরা চায় না যে নারায়ণ নিঃস্বার্থ ভাবে কাজ করুক। নারায়ণ যে ভাবে সভা সমিতি করছে তাতে গ্রামের অনেকেরই ধারণা নারায়ণের স্বার্থ আছে। তবে নারায়ণ জানে এগুলি তার প্রাপ্য। তাই সে কারুরই কোন কথা শোনে না। সে চায় বিরূপ সমালোচনা হোক। অধিকাংশ মানুষের একই কথা—আমি নিঃস্বার্থ ভাবে কাজ করতে যাব কেন? আমার কি স্বার্থ আছে? নিঃস্বার্থ জীবনের স্বাদ মানুষ পেতে পারে না এই কদর্য স্বার্থের সমাজে। যারা পেতে চায় তাদেরকে ঈর্ষার প্রাচীর ডিঙাতে হয়।

নারায়ণ এক গ্লাস জল খেয়ে বেরিয়ে পড়ে। তার প্রতিষ্ঠিত ক্লাবে যায়। ক্লাবের নাম 'সানরাইজ' অর্থাৎ সূর্যোদয়।

সূর্যোদয়ে উপস্থিত হয়ে সে প্রভাকরের খোঁজ করে। ক্লাবের বারান্দায় অনেক লোক বসে থাকে। কেউ তাস, কেউ দাবা খেলে।

ক্লাব ঘরটি যদিও মাটির তৈরী, কিন্তু খুব সুন্দর ভাবে সাজানো। গ্রামের মধ্যে এই সংঘটাই জোরদার। আরও একটা সংঘ আছে। নাম 'রামকৃষ্ণ সংঘ'। উপরে রামকৃষ্ণ হলেও ভিতরে শুঁড়িখানা। রাহাজানিতে ভরপুর। তাই কয়েকটি লোক ছাড়া সকলের দৃষ্টি 'সানরাইজে'র দিকে।

নারায়ণ ক্লাবের মধ্যে বিপ্লব এবং প্রভাকরকে না পেয়ে ঘোষেদের দু-চালায় উপস্থিত হয়। কিন্তু সেখানেও না পেয়ে খুঁজতে খুঁজতে চলে যায় গ্রামের শেষ প্রান্তে। যেখানে সুন্দরী পুকুরের পাড়ে, সংসারের প্রচণ্ড অভাবে চোখের জলে নিজের বাস্তু-ভিটা বিক্রী করে এসেছে হরকালী। সে সেখানে একটা ছোট মাটির বাড়ী তৈরী করে বাস করে।

পাশ দিয়ে একটা ছোটো নদী চলে গিয়েছে। নদী বললে হয়ত ভুল হবে, কাঁদর বলাই শ্রেয়। নাম মণিকর্ণিকা। কাঁদরের দু-ধারে সবুজ গাছের শোভা বড় মনোরম। এরই ধারে হরকালী এবং দেবকীর বাস। দেবকী হরকালীর মেয়ে।

অর্থের অভাবে দেবকীর বিয়ে দেয় এক পঞ্চাশ বছরের বৃদ্ধের সঙ্গে। সে এখন পৃথিবীর মরুভূমির উপর দিয়ে হাঁটছে।

নারায়ণ হরকালীর বাড়ীতে উপস্থিত হয়ে প্রভাকর এবং বিপ্লবের দেখা পায়। বিপ্লব এবং প্রভাকর নারায়ণকে দেখে অবাক হয়ে যায়।

বিপ্লব বলে—তুই কি করে জানলি আমরা এখানে আছি ?

নারায়ণের কথা বলার আগেই হরকালী বলে— বস নারায়ণ, বস বাবা, বস। ঐ চটাইটো টেনে লে। গরীবের এই সম্বল।

প্রভাকরও বলে—তু কি করে জানলি আমরা এখানে আছি ?

—এখানে তোদের আড্ডা তা আমি জেনেছি ভোঁদার মুখে।

হরকালী নারায়ণের পিঠে হাত বুলিয়ে বলে—তোরা না এলে আমার ভাল লাগে না। আমার অবস্থা এখন খুবই খারাপ। তারপর দেবকী হয়ত বিধবা হবে। বাবা, সারা জেবন দুঃখই পেলাম।

নারায়ণের চোখ জলে ভরে ওঠে—আমি শুনেছি, দুঃখ করে

আর কি করবে ? দেবকীর মা মরে গেল দেবকীর বিয়ের পর। এটাও খুবই দুঃখের।

বিপ্লব বলে—আর পুরানো কথা তুলিস না।

হরকালী চোখের জল ধরে রাখতে পারে না। বিপ্লব ও প্রভাকরের মুখ দুটি লাল হয়ে যায়। উভয়ে উভয়ের মুখের দিকে তাকায়। হরকালী একটা মাছ ধোয়া ঝাঁঝুরি বুনছিল। ঝাঁঝুরিটা রেখে দিয়ে কাপড়ের খুঁট দিয়ে চোখ মুছে বলে—বাবা নারায়ণ, জানিস, দেবুর মাকে হারালাম, ভাবলাম দেবু খানিক সুখী হল। কিন্তু ...

চোখের জল মুছে বলল—শান্তি এল না রে, শান্তি এল না।

নারায়ণ মাটির দিকে তাকিয়েছিল আর দাঁতে ঠোঁট কামরাচ্ছিল। কিছুক্ষণ পর বলল—মামা, চোখের জল মোছ। দুঃখ যতই বাড়াবে ততই বাড়বে।

—জল তো মুছতেই হবে, কিন্তু এ বড় কঠিন!

নারায়ণ বহু কষ্টে নিজেকে সামলে প্রভাকর এবং বিপ্লবকে বলে—চল, তোদের সঙ্গে একটু দরকার আছে।

তারপর হরকালীকে বলে—মামা বস, আমরা চলি।

—আবার আসিস বাবা।

নারায়ণ হরকালীকে হয়ত গ্রাম সম্পর্কে মামা বলে, কারণ গ্রামের সকলের মধ্যেই একটা পারস্পারিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছে।

তারা হরকালীর অশ্রুসজল করুণ দৃষ্টির অন্তরালে চলে যায়। যাওয়ার রাস্তায় তাদের মধ্যে একটা নীরবতার ঢেউ খেলতে থাকে।

বেশ কিছুক্ষণ পর নারায়ণ বলে—প্রভাকর, আজ আসরে যাস। বিপ্লব, যেন ভুলে যাস না।

প্রভাকর বলে—এই বলার জন্য এসেছিলি ?

বিপ্লবের হৃদয়ে বাজতে থাকে হরকালীর "এ বড় কঠিন" কথাটি।

—নারায়ণ, হরকালীদার কথাটা তোর মনে লাগে নি ?........ 'মানুষের জীবনে দুঃখ আসে মানুষকে ধ্বংস করতে রে।'

নারায়ণ বলে—ভ্যাখ ভাই, ও রকম আমাদের জীবনেও আসতে

পারে। মানুষের জীবনে দুঃখটা একটা অঙ্গ।

বিপ্লব বলে—তাহলে মানুষ কাতর হয় কেন?

নারায়ণ একটু জোর দিয়ে বলে—আজ আসরে যাস, সব বলব।

কথা কয়টি শোনা মাত্রই প্রভাকর বলে—আজ কিছু নতুন বিষয় আছে নাকি?

নারায়ণ উত্তর দেয়—আজ আসরে না গেলে বুঝতে পারবি না। তাই তো যেতে বলছি।

কথাগুলি বলার পর নারায়ণ গম্ভীর হয়ে যায়। তার সামনে একটা নারীর ছবি ভেসে ওঠে, যাকে মান-ইজ্জতের ভয়ে পল্লীর গহন বনে পড়ে থাকতে হবে! পাড়া-প্রতিবেশীরা ঘৃণা করবে। মানুষ কি এতই পাষণ্ড!

প্রভাকর এবং বিপ্লব সংসারের কথা কইতে কইতে যেতে থাকে। তবে নারায়ণ একটা পথ তৈরী করার চিন্তা করে। তাই তার মুখের উপর একটা লাল আবরণ পড়ে যায়।

বেশ কিছুক্ষণ নারায়ণ চুপ করে থাকাতে প্রভাকর বলে—নারায়ণ, কি ভাবছিস?

নারায়ণ তাড়াতাড়ি নিজের চিন্তার জাল ঠেলে মাথা নেড়ে বলে—কিছু না।

—ও, তোর বুঝি হরকালীদার কথাটা মনে পড়ছে?

নারায়ণ কথা বলে না। তারপর ঘরোয়া আলোচনার মধ্য দিয়ে ফুরিয়ে আসে তাদের পথ। তারা উপস্থিত হয় সূর্যোদয়ে।

গোধূলি বেলা আকাশ ঢেকে ফেলে। পাখীদের বিশ্রামের পরিবেশ সূচিত হয়। প্রতিদিনের মতো গ্রামের বেশ কিছু মানুষ আসর জমিয়েছে। বিপ্লব ও প্রভাকর তাসের আসরে বসে যায়। কিন্তু নারায়ণের মনে বিরাট ব্যস্ততার ছাপ ফুটে ওঠে। সে বিপ্লব ও প্রভাকরকে বসতে বলে বাড়ীর দিকে রওনা হয়। কিছুদূর যাওয়ার পর আবার ফিরে আসে। তার ফেরা দেখে বিপ্লব ও প্রভাকর জিজ্ঞাসা করে—কিরে, ফিরলি কেন?

প্রশ্নের জবাবে নারায়ণ মিষ্টি সুরে বলে—ঘরে গেলে তো কথা শুনতে হবে।

পল্লীর বুকে অন্ধকারের পর্দা নেমে আসে। পাখিদের কিচির-মিচির শব্দে গাছগুলি ভরে যায়। বাঁশ গাছে, তেঁতুল গাছে নানান পাখিদের বাসাগুলি সারা দিনের পর আবার নতুন করে প্রাণ পায়। বাচ্চারা পায় তাদের মায়েদের। আর অভাগিনী রেবতী পায় শত চিন্তার ফুলঝুরি।

রেবতী একবার ঘরের ভিতরে ঢোকে আবার বাইরে আসে। যাব কি যাব না—এই তার চিন্তা। ঘরের কোণের নারীরা প্রতিবেশীদের ধিক্কারে বাড়ির বাইরে আসতে পারে না। কিন্তু যারা আসে তারা রমণীর মর্যাদা হারায় কি? অবশ্য যারা নিজেদের ইজ্জত বিক্রি করার জন্য আসে, তাদের আসা উদ্দেশ্য-প্রণোদিত। তারা বৃহত্তর সমাজের গণ্ডীতে পুরুষ মাতিয়ে জীবনের অপরাহ্নে না হওয়ার আশায় ব্যাকুল হয়, তাদের ট্রাজেডি বড় করুণ।

রেবতী চায় বিশাল সমাজে নিজের দুঃখের কথা তুলে ধরতে। ধিক্কারের বাণী হজম করে সমাজে চাবুক মারতে তার দুটি মনের একটি মন প্রস্তুত। কিন্তু একটি মনের জন্য সে একবার আকাশের দিকে তাকায়। ঘন অন্ধকারের মাঝে নিজেকে হারিয়ে দেয়। এক অব্যক্ত বেদনায় তার সারা শরীর শিহরিত হয়। বাড়ির সামনে বাঁশ ঝোপের মধ্যে নিজেকে হারিয়ে দেয়। আবার মনকে শক্ত করে। এ সংশয় চলে তার দীর্ঘ সময় ধরে। তবে তার একটা মন সর্বদা প্রস্তুত।

সময় হয়ে আসে আসরের। দুই-এক করে আসরের সভ্যরা আসতে থাকে। আসরে প্রচুর লোক না আসলেও আলোচনা হয় বড় সুন্দর। রামায়ণ না হয় মহাভারত পাঠ হয় প্রত্যহ। তার মাঝে মাঝে

আলোচনা হয় মানুষের সমস্যা নিয়ে।

গ্রামের মানুষের একদিকে যৌন চিন্তা, অন্যদিকে দারিদ্র। অজস্র সমস্যা, মানসিকতা নষ্ট হয়ে গেছে, মনুষ্যত্ব হারিয়ে গেছে মানুষের। একজন মুরুব্বি সেজে শোষণ করতে ব্যস্ত।

আসতে আসতে বেশ কিছু লোক জড়ো হয় আসরে। সরকারও লণ্ঠনটা হাতে নিয়ে উপস্থিত হয়। হাতে তার কোন বই নেই। লাঠিটা বগলে ভরা। আসরে উপস্থিত হয়ে চারিদিক তাকিয়ে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বলে—নারায়ণ আসে নি?

মটর বায়েন তাড়াতাড়ি বলে—না খুড়ো, আসে নি।

তারপর চাটাইটা পেতে দেয়। সরকার কোন কথা না বলে গম্ভীর হয়ে যায়। সুধীর বাগ্দী তাড়াতাড়ি উঠে বলে—খানিক দেখব নাকি?

—না-না, দেখতে হবে না, ও আসবেই।

আসরের মধ্যে বেশ ব্যস্ততার ঢেউ খেলে যায়। কি ব্যাপার! কি ব্যাপার! সকলের মনে কৌতূহল। কারণ নারায়ণের প্রতি অনেকের সন্দেহ আছে। কিছুক্ষণ পর নারায়ণ, বিপ্লব ও প্রভাকর এসে উপস্থিত হয়। নারায়ণের উপস্থিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সরকারের মুখ থেকে হাসির ছটা বেড়িয়ে আসে, কিন্তু কোন কথা বলে না।

নারায়ণ বলে—কখন এলে?

—এই তো আসছি। তুই কোথা ছিলি?

—'সানরাইজে'।

—কিন্তু সে কোথা?

—আসে নি?

চারদিকে তাকিয়ে বিপ্লব এবং প্রভাকরকে বসতে বলে সে এক দৌড় দেয়।

শৈল তখন রাতের খাবার করার জন্য ব্যস্ত। কয়েকটা রুটি এবং একটু কুমড়ার ছক্কা তাদের খাবার। শৈলর মুখে বেশ বিরক্তির ভাব। কারণ রেবতী তাকে সহযোগিতা করে না। তাই তার কাজের মধ্যে দুম-দাম শব্দ ওঠে।

এমন সময় নারায়ণ সেখানে উপস্থিত হয়—কি গো শৈল পিসি, ভাল আছ ?

—বস বাবা, বস। বলে শৈল একটা চাটাই পেতে দেয়।

রেবতী চুপ করে বসে থাকে। নারায়ণ রেবতীর দিকে তাকিয়ে বলে—সরকারকা ডাকছে।

শৈল তাড়াতাড়ি বলে—কিসের লেগে বাবা ?

—দরকার আছে।

—আমি যাব না। কালকে আমাকে ঘরের বাইরে যেতে হবে।

নারায়ণ একটু বিরক্ত হয়ে বলে—ঠিক আছে, যাস্ না, মরবি।

এই কথা কটি বলে নারায়ণ উঠে দাঁড়ায়।

শৈল তাড়াতাড়ি উঠে এসে বলে—কি দরকার বাবা ? আমি গেলে হবে না ?

—না, ওর সঙ্গে কি বিশেষ দরকার। আমি নিয়ে যেতাম, আবার দিয়ে যেতাম।

—ও পোড়া মুখী, কপাল পুড়ি, দেখে আয় না ক্যানে।

—কালকা যখন পাশের বাড়ী থেকে গা জ্বালা করা কথা আসবে তখন কি করব বল ?

—তবে চল, আমি নিয়ে যেছি।

নারায়ণ বলে—আমার সঙ্গে গেলেই বা দোষ কি ?

—না-না-না, কোন দোষ নাই। রেবতী, যা না মা····

রেবতীর মনের রুদ্ধ দ্বারগুলো খুলে যায়। মনের মলিনতা সব পুড়ে ছাই হয়ে যায়। নিজেকে কিছুটা শক্ত করে বাস্তব পৃথিবীর স্মুসখীন হওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়। অবহেলায় জীবন শেষ করে দেওয়া যায় না তা রেবতী কিছুটা বোঝার চেষ্টা করে। মাথার কাপড়টা তুলে নিজেকে কিছুটা শক্ত করে নিয়ে ছুয়োর পার হয়।

রাস্তা অন্ধকার। অন্ধকার মরুভূমিতে ছুটি জীব যেন জলের সন্ধানে বের হয়। অন্ধকারের অন্তরেতে চোখের জল মিললেও পানের জল পায় না। পাওয়ার আশা হয়ত আছে। কিন্তু বহু দূরে। নারায়ণ

আগে আগে রেবতী পিছনে পিছনে চলতে থাকে।

কিছুদূর যাওয়ার পর নারায়ণ জিজ্ঞাসা করে—রেবতী, তোকে অত গম্ভীর দেখাছিল কেন? সব যেন ভুলে গিয়েছিলি?

রেবতী নিজেকে একটু সামলিয়ে নিয়ে বলে—হ্যাঁ।

—ও! এটা স্বাভাবিক।

ওরা চলতে থাকে। এদিকে সরকার দীর্ঘ প্রতীক্ষায় বসে আছে আসরে। সামনে একটি লণ্ঠন। চারদিকে বসে আছে গ্রামের অনেক মানুষ।

রামায়ণের পাতা বন্ধ। পড়বার সময় যে চশমাটা ব্যবহার করে থাকে, সেই চশমাটা রামায়ণের উপর পড়ে আছে। অন্যান্য লোকেরা তাদের মধ্যে মত বিনিময় করতে থাকলেও সরকার চুপ করে বসে থাকে।

কিছুক্ষণ পর নারায়ণরা এসে উপস্থিত হয়। আসরের সমস্ত লোক স্তম্ভিত হয়ে যায়। লজ্জায় সঙ্কুচিত মেয়েটিকে দেখে সকলেই চিনতে পারে। কিন্তু সবাই নির্বাক হয়ে যায়, এ-ওর মুখের দিকে তাকায়. সকলের মুখে ছি-ছি ভাব। প্রভাকর বিপ্লবের কানে কানে বলে—এ ঠিক নয়।

কিন্তু সরকারের মুখে হাসির রেখা ফুটে ওঠে। ঠোঁট দুটি ফাঁক হয়ে হাসির দৃষ্টান্ত স্বরূপ কয়েকটি বাঁধানো দাঁত বের হয়ে আসে।

তারপর করুণ দৃষ্টিতে রেবতীর দিকে তাকিয়ে বলে—মা রেবু, বস।

রেবতীর সারা দেহটি লজ্জায় ভয়ে শিউরে ওঠে। কথা বলেনা। গুমরে-গুমরে কাঁদা হৃদয়ের একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস যেন তার শব্দ শোনা যায়।

নারারণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। জীবনের মাঝে আশার পথ বড় প্রশস্ত। রেবতীরও আশার পথ বড় প্রশস্ত। সে চায় অনেক কিছু বলতে।

সে মুখের কাপড় খুলতে চায়। কিন্তু কি এক লজ্জা তাকে গ্রাস করে। নারায়ণও চুপচাপ। আসরের সকলে তার উদ্দেশ্য জানতে চায়। অনেকের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে যায়। প্রশ্ন তোলে—কি ব্যাপার, ব্যাপার কি?

নারায়ণ মুখ খোলে—আপনারা সকলেই জানেন, রেবতী আজ মহা সমুদ্রের মাঝে। কথাটি পরিষ্কার করে বলি—রেবতীর আজ দুঃখের শেষ নাই।

নবকুমার শিকদার উঠে বলে—এখানে এলেই কি দুঃখ লাঘব হবে?

সরকার থাকতে না পেরে বলে—লাঘব হবে না জানি, কিন্তু এ বিষয়ে তোমার মত কি?

—রেবতী নারায়ণের সঙ্গে ঘোরে কেন? ও ওর স্বামীর কাছে থাকতে পারে।

নারায়ণের সারা দেহ কেঁপে ওঠে। কিছু বলে না। রেবতীর কণ্ঠ হতে চাপা কান্না শোনা যায়।

সরকার নিজের রাগ চেপে বলে—তুমি কি মনে কর নারায়ণের সঙ্গে রেবতী এসেছে কোন খারাপ উদ্দেশ্য নিয়ে? আর স্বামীর কাছে যাওয়ার কথা বলছো, সে গিয়েছিলো, ওর স্বামী আর একটা বিয়ে করেছে। ওকে ঝাঁটা লাথি মেরে তাড়িয়ে দিয়েছে। তারপর আবার....।

—কিন্তু এর পিছনে কি কিছু কারণ আছে?

—কারণ মানে?

—সে কেন তাড়াল এবং কেনই বা আবার বিয়ে করল?

—ওইখানেই তো পুরুষের মনুষ্যত্বের পরাজয় ঘটেছে। পুরুষের মনুষ্যত্ব যদি ভালোত্বে অধিষ্ঠিত হতো তবে এই সমস্যা এত জটিল হতো না।

—মনুষ্যত্ব বিচার করার মতো ক্ষমতা আমার নাই, তবে ওর স্বামীর কাছে যাওয়া উচিত।

—যদি ওর স্বামী ওকে না নেয় তবু জোর করে যেতে হবে ? ওর স্বাধীনতা নাই ?

—গাঁ ঘরের ব্যাপার, বুঝলা। মনুষ্যত্ব-টনুষ্যত্ব কিছু বুঝি না, মেয়েদের একটু সহ্য করতে হবে। না হলে গাঁ নষ্ট হয়ে যাবে।

নারায়ণ থাকতে না পেরে গর্জে ওঠে—নবকুমারদা, তুমি বড় বাড়াবাড়ি করছো। তোমাতে আর হালদারে আমার অনেক কুৎসা রটনা করছো। এর পরিণাম কিন্তু খারাপ।

—কি, আমাকে ভয় দেখাচ্ছিস ?

—ভয় দেখানো নয়। রেবতীর কাছে কিসের জন্য যাই জিজ্ঞেস কর।

—জিজ্ঞাসা করার দরকার নাই।

—তা হলে আর কখনো কোন কথা বলবে না।

সরকার উঠে দাঁড়ায়—আহা, বাবা নারায়ণ, ওরা না কথা বলে, ওদের মন নদীর বালির মতো ঝড়ো হাওয়ায় ওড়ে।

রেবতীর প্রত্যেকটি অঙ্গ থেকে লজ্জার কাঁপুনি ঝড়তে থাকে। রেবতীর মুখের কথা গভীর অন্ধকারে মিলিয়ে যায়।

সরকার কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকে। তারপরে আবেগে বলে ওঠে—ওরে রেবু, তু ফিরে যা—তু ফিরে যা....

নারায়ণের অন্তরে কথাগুলো গেঁথে যায় ফিরে আজকে নিয়ে যেছি, কিন্তু আবার নিয়ে আসব।

সকলে হো হো করে হেসে ওঠে।

সরকার বিরক্ত হয়ে ওঠে—চুপ কর সব।

নারায়ণ পথ ধরে। রেবতী অনুসরণ করে তাকে। অন্ধকার হতে আলোর দিকে চলে। রেবতী আলো দেখতে না পেলেও নারায়ণ পায়।

রাস্তায় যেতে যেতে বলে—নারায়ণদা, আমাকে একটু শক্ত হতে হবে।

—শক্ত না হলে তোর মহা বিপদ। দেখছিস তো।

রেবতী চোখের জল মুছে বলে—এর শেষ কোথা… ।'

—রেবতী, অত তলে যাস না।

—না নারায়ণদা, আমাকে বুঝতে হবে।

নারায়ণ ঘুরে দাঁড়ায়—রেবতী!

রেবতীর কথা বন্ধ হয়ে যায়। তারপর যথারীতি চলতে থাকে। রেবতীকে বাড়ীর কাছে পেঁৗছে দিয়ে নারায়ণ পুনরায় আসরে ফেরে।

আসর বেশ গরম। নারায়ণ আসা মাত্রই দেবু হাজরা বলে—তোর ভাল হচ্ছে না, গাঁ খারাপ হয়ে যাবে।

সরকার কথাগুলো শুনে মুখ বিকৃত করে বলে—গাঁ খারাপ হলো তো তোর কি?

—সরকার, তুমি বোঝ না।

—তু খুব বুঝিস্! নারায়ণ উত্তেজিত হয়ে বলে।

উভয় পক্ষই বেশ উত্তেজিত হলে সরকার জল ঢালে। রাতও হয়ে আসে। সরকার নারায়ণকে ধরে নিয়ে চলে আসে।

—নারায়ণ, তু রেবতীর স্বামীর কাছে একটা চিঠি পাঠিয়ে দে। গাঁয়ের অবস্থা দেখছিস তো। গ্রাম্য রাজনীতি খুবই কঠিন। তোর বিপদ হবে।

—সত্যই কাকা, বড় মুসকিল। তবে রেবুকে বৃহত্তর সমাজে আনতে হবে।

—কিন্তু গ্রামের অবস্থা দেখছিস, সবাই তোর ওপর খাপ্পা।

—তোমার আশীর্বাদ পেলে সব ঠিক করে দেব।

সরকার বেশ কিছুক্ষণ চিন্তা করে বলে—আমি ভাঙতে চাই। এ সমাজ আমি ভাঙতে চাই।

—কাকা, তা হলে কি করা যায়?

—রেবতী আসবে?

—আমি যা বলব করবে।

—তা হলে এক কাজ কর, মহিলা সমিতিটা পুনরায় খোল। বহু দিন আগে তেরুবালা খুলেছিল, তারপর থেকে ধামাচাপা পড়ে যায়।

নারায়ণ লাফিয়ে ওঠে।

—ভাঙব, নিশ্চয় ভাঙব। তুমি হবে জজ, আমি জহ্লাদ। তুমি হুকুম দেবে, আমি দড়ি পরাব।

—তবে একটা কথা, রেবতী যদি ওর স্বামীর কাছে যেতে চায়, যেতে দেওয়াটা তো ঠিক।

নারায়ণ একটু চুপ করে থেকে বলে—ওর সঙ্গে কথা বলছি। তবে সতীত্ব বিসর্জন দেওয়া উচিত নয়।

—নারীদের এই ক্রোনিক রোগটা সারাতে গেলে ভাল ওষুধের দরকার।

—নিশ্চয়ই ভাল ওষুধের দবকার। স্বামীর কাছে পচে মরার দিন নয়। আলোতে আনতেই হবে।

চলার পথ শেষ হয়ে আসে। সরকারকে বাড়ীতে পেঁৗছে দিয়ে নারায়ণও বাডী ফেরে।

॥ আট ॥

সংবাদটা শুভ নয়। উস্‌কো-খুস্‌কো চুল, দেহে একখানি মলিন সাদা জামা, পরনে অনুরূপ কাপড়। মনোমোহন উপস্থিত হয় হরকালীর বাড়ীতে। হরকালী উঠানে বসে ঝুড়ির বাতা তৈরী করছে। লোকটাকে দেখে অবাক হয়ে যায়। খুবই পরিচিত লোকের হঠাৎ আগমন, এক বিস্ময় ডেকে আনে হরকালীর মনে। অশুভ কোন ইঙ্গিত তার কাছে থাকলেও হরকালীর আহ্বান খুবই মধুর হয়।

মনোমোহন অবশ্য চাপা বেদনা প্রকাশ না করে পারে না। দেবকী বিধবা হয়েছে। কথাটা হরকালীর সমস্ত চোখের জল বের করে আনতে পারে না, তাকে অজ্ঞান করে দেয়। মনোমোহন কাজের বেগতিক

দেখে দৌড়ে গিয়ে ঘরের ভিতর থেকে জল এনে মাথাটা কোলে তুলে নিয়ে জল ঢালতে থাকে। কিছুক্ষণ পর হরকালী চোখ ছুটো খুলে মনোমোহনের মুখে ফেলে বলে—দেবু কোথা ?

তারপর চোখের কোণ দিয়ে বেরিয়ে আসে জলধারা। হরকালী চীৎকার করে ওঠে।

সংবাদটা গ্রামের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। পাড়া প্রতিবেশীরা সান্ত্বনা বাণী নিয়ে ছুটে আসে। মেয়েরা চোখের জলে সহানুভূতি জানাতে থাকে।

খবর নারায়ণের কাছেও পেঁৗছায়। তবে গ্রামের মধ্যে তেমন সাড়া জাগে না। কারণ এ রকম ছুঃখ তো অধিকাংশ ঘরেই আছে। তবে ত্রিভঙ্গ সরকার হু-হু করে কেঁদে ওঠে। সে পচা সমাজের বুক থেকে ভূমিকম্প দাবি করে। সরকার হরকালীর গলা জড়িয়ে ধরে শুরু করে কান্না। কিছুক্ষণ পর সরকার চুপ করে, কিন্তু হরকালী করে না।

নারায়ণও এসে উপস্থিত হয়। হরকালীর কান্নায় সে সুর না মিলিয়ে থাকতে পারে না। বৃদ্ধ হরকালীর সামনে ভেসে ওঠে মেয়ের মলিন রূপ। অবশ্য দেবকী তার এই দিনের কথা চিন্তা করেই পাল্কীতে উঠেছিল। দেবকী কয়েক দিনের জন্য যে খেলাঘরকে তৈরী করে তা কালবৈশাখীতে ভেঙে দেয়। আমাদের সমাজ যেন ইচ্ছা করেই এই সমস্ত তরুণীকে অসহায় করে, ভোগের সামগ্রী করে।

সরকার হরকালীকে বলে—তোকে এখন আর এখানে থাকতে হবে না। আমার ঘর চ।

হরকালী ঘাড় নাড়ে।

সরকার মনোমোহনকে তার বাড়ী যেতে বলে। কিন্তু সে যেতে না চাওয়ায় সরকার কোন কথা না বলে চুপ করে বসে থাকে।

এদিকে রেবতীও খবর পেয়ে যায়। খবর পাওয়া মাত্রই তার হৃদয় গুমরে-গুমরে কেঁদে ওঠে। দেবকীর জীবনে হয়ত সারা জীবনের মতো সাদা সকাল নেমে আসে। সে সাদা কাপড় পরে হরকালীর সামনে

এসে দাঁড়াবে। মা হারা শিশু, হরকালীর ঘাড়ে এসে সে হয়ত বসবে। তার যৌবন নিংড়ে নিংড়ে খাবে। মুক্তির পথ কি মৃত্যু হতে পারে ?

রেবতী হয়ত জানে, কোন দিনই নয়। তাই রেবতী কঠিন ব্রত পালন করতে রাজী। সেই ব্রতকথা দেবকীকেও শোনাতে চায় সে।

কিন্তু হরকালী আকুল হয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে দেবকীর প্রতীক্ষায়। অজস্র সান্ত্বনার বাণী তার কানে আসে। অবশ্য সে বাণী কোন আলোড়ন সৃষ্টি করতে পারে না।

বেশ কিছুক্ষণ কেটে যাওয়ার পর হরকালীর বাড়ী জনশূন্য হতে থাকে। সরকার মাঝে মাঝে বলে—হর ওঠ. অমন করে কাঁদলে হবে ?

হরকালী বুক চাপড়ায় এবং মাথা ঠোকে।

—তুই অত ভেঙে পড়লে দেবুকে কে সান্ত্বনা দেবে ?

—সবই বুঝতে পারছি। কত্তু এখন উপায় ·

—জল খাবি ?

—হ্যাঁ ভাই, একটু জল দে।

নারায়ণ তাড়াতাড়ি ঘটিতে করে জল আনে। হরকালী মুখ লাগিয়ে কয়েক ঢোক জল খায়। তারপর আবার সরকারের গলা জড়িয়ে ধরে কান্না শুরু করে।

বেশ কিছুক্ষণ কেটে যায়। হরকালী মাঝে মাঝে কপাল চাপড়ে ঈশ্বরকে দোষারোপ করতে থাকে। তার রক্ত মাঝে মাঝে হিম হয়ে আবার গরম হতে থাকে। সে দেখে, দেবকী মরুভূমির ওপর ছুটছে।

এদিকে রেবতী এবং শৈলজার মধ্যে বেশ বাক্-বিতণ্ডা শুরু হয়। রেবতী চায় হরকালী হাজরার অশ্রুতে অশ্রু মেলাতে। কিন্তু শৈল তাকে একা আসতে দিতে চায় না। কিন্তু রেবতী মানতে রাজী নয় শৈলর শাসন।

অবশেষে শৈল হার মানে—পোড়ামুখী যা, তবে তাড়াতাড়ি আসিস, পিণ্ডি গিলবি।

রেবতী এসে উপস্থিত হয় হরকালীর ঘরে। হরকালী নারায়ণের কোলে মাথা দিয়ে শুয়ে আছে। রেবতী চুপ করে উঠোনে এসে দাঁড়ায়।

হরকালীর চোখ গিয়ে রেবতীর উপর পড়ে—নারায়ণ, রেবতী লয় ?

নারায়ণ অন্য দিকে তাকিয়ে ছিল। হঠাৎ কারেণ্টের মতো কথাটি তার কানে লাগে। সে মুচকি হাসে—হ্যাঁ।

হরকালীর চোখ আবার অশ্রুপূর্ণ হয়ে যায়।

রেবতীর হৃদয় হতে এক দমকা হাওয়া অশ্রুরূপে বেরিয়ে আসে। সে আঁচল দিয়ে চোখ মোছে। সরকার হাত ধরে রেবতীকে বসায়।

পড়ন্ত বেলায় পশ্চিমাকাশে সূর্য ঢলে পড়েছে। বাতাসে বাতাসে কান্না-ধ্বনি। হরকালী দৃষ্টি ছুড়ে দেয় ফাঁকা মাঠের দিকে, ছোট্ট কাঁদরের দিকে। কাঁদরের দুই পাড়ের আম গাছগুলোর ফাঁক দিয়ে তার দৃষ্টি চলে যেতে থাকে দূরে, বহু দূরে। হরকালী যেন তার মাঝে দেখে শুধু কচি মুখে বৈধব্য।

কিছুক্ষণ পর নারায়ণ একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বলে—আর দুঃখ করে লাভ নাই। যা হওয়ার তা তো হলো, এখন একটু বিশ্রাম কর।

রেবতী উঠে দাঁড়ায়—নারায়ণদা, তোমার সঙ্গে বাড়ী যাব ।

হরকালী হু-হু করে কেঁদে ওঠে—মা রেবু, আবার আসিস।

রেবতীও কান্না ধরে রাখতে পারে না। স্বামীর মৃত্যুর দামামা সে হয়ত শোনে নি, তবে তার দুঃখ আরও কঠিন।

রেবতী এবং নারায়ণ রাস্তা ধরে। হরকালীর চোখ দুটো স্থির হয়ে যায়। কথা বেরোয় না, শুধু ইঙ্গিতে বিদায় জানায়।

অ-ফুরন্ত রাস্তায় যেন নির্বাক দুই জীব। জিজ্ঞাসার কুণ্ডলী মনে, প্রকাশের নালায় পলি। শুধু স্বাভাবিক কথা। মনের কথা নয়। নারায়ণ চায় বিদ্যুৎ। সমাজের বুকে সে তার টেনেছে. কিন্তু বিদ্যুৎ পায় নি। তাই সে অন্ধকারে চলেছে।

—রেবতী, তোর সাহস তো কম নয়!

রেবতী মিচকী হাসে।

—জানিস, বড় বেদনাদায়ক ঘটনা।

– এর কোন প্রতিকার নাই?

—প্রতিকার আমরা…

—তোমরা? ঠিকই বলেছ।

—যাক, তোকে একটা কথা বলা হয় নি। সরকারকার সঙ্গে যুক্তি করে তোর স্বামীর কাছে একটা চিঠি পাঠানো হয়েছে। নিলে তুই যাবি তো?

—আবার যেতে বলছ?

—কেন রে! স্বামীর কাছে যাবি না?

—না, যেতে ইচ্ছা নাই।

নারায়ণ একটু কৌতুকের সুরে বলে—কেন রে, প্রেম জমাতে পারিস নি?

—আমার তরফ থেকে কোন কসুর ছিল না।

—হ্যাঁ, সস্তর পতিত্বের কাছে তোর মনুষ্যত্ব বলি হয়েছে।… আচ্ছা রেবতী, তুই যে আমার সঙ্গে চলছিস এতে তোর প্রতিবেশীরা ঠাট্টা করবে না?

—নারায়ণদা, বেরিয়ে যখন এসেছি তখন আর কাউরি কথা শুনব না।

—রেবতী, বেরিয়ে আসতে হবে মনুষ্যত্ব নিয়ে।

—হ্যাঁ, ঠিকই, আমি এখন মরিয়া। হতভাগিনী দেবু…

—ওর জন্য চিন্তা করতে হবে।

কথা প্রসঙ্গে নারায়ণ বলে—আমরা একটা মহিলা সমিতি খুলছি। তোকে সভানেত্রী করব।

—বল কি! আমি ওসব কিছুই জানি না।

নারায়ণ একটু হেসে বলে—সব পারবি। আমি আছি তো।

—তা হলে দেবুকেও আনতে হবে।

—সে দেখা যাবে। তবে আজ আসরে চল।

—না, আজ আর আসরে যাব না।

—না-না, চল।

এদিকে সরকার মনোমোহনের এবং হরকালীর খাওয়ার ব্যবস্থা করে আসরে ফেরে। মনোমোহন অবশ্য সরকারকে বলে যে, দেবকীর সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি দেবকীকেই পাইয়ে দেওয়ার জন্য সে আপ্রাণ চেষ্টা করবে।

এদিকে আসরে দু-একজন করে আসতে শুরু করেছে। সরকারও উপস্থিত হয়। সরকার চুপ করে এসে বসে। বিভিন্ন জনের মুখে বিভিন্ন ধরনের কথা। কেউ দেবকীর. কেউ বা নারায়ণ-রেবতীর। কিন্তু সরকারের মুখে কোন কথা নেই। কিছুক্ষণ পর দোকানী দোকান থেকে বেরিয়ে এসে বলে—সরকার মশাই, হরকালীর খবর কি ?

—খবর নিশ্চয়ই খারাপ।

— সর্বনাশ হল।

— সর্বনাশ বলে সর্বনাশ।

আসর নিস্তব্ধ হয়ে যায়। সকলের মধ্যে করুণার ভাব। ঠিক সেই মুহূর্তে নারায়ণ এবং রেবতী উপস্থিত হয়। এই দুঃখের মধ্যেও তারা সরকারের কাছ থেকে প্রসন্ন সম্ভাষণ পায়।

—আয় রেবু-নারায়ণ, বস।

দুজনে সরকারের কাছেই বসে। আসরের অধিকাংশ মানুষের দৃষ্টি রেবতীর দিকে। তবে আজ রেবতী ভীত বা লজ্জিত নয়। সে বুঝেছে বাঁচার রাস্তা তাকেই করতে হবে।

নারায়ণ সরকারকে বলে—যে ভাবে মেয়েদের সর্বনাশ নেমে আসছে, এ তো আমাদের চিন্তার বিষয়।

আসরের সকলে হো-হো করে হেসে ওঠে। 'সরকার বিরক্ত হয়ে বলে—চুপ কর, চুপ কর।

সরকারের ধমকে আসর কিছুটা নিস্তব্ধ হলেও কানাকানি এবং ফিসফিসানি চলতে থাকে।

নারায়ণ বেশ জোরের সঙ্গে বলে—আমরা একটা মহিলা সমিতি গঠনের ব্যবস্থা করেছি। রেবতী পরিচালনা করবে।

খগেন হালদার তাড়াতাড়ি উঠে বলে—কি, বলছিস কি? এই নষ্টার লেগে আরও পাঁচটা মেয়ে নষ্ট হবে?

নারায়ণ রেগে ওঠে—তুমি বড় বাড়াবাড়ি করছ। ভাল হবে না কিন্তু।

সরকার নারায়ণকে চুপ করতে বলে।

কিন্তু হালদার বলে—রেবতী, তুই কাল থেকে এখানে আসবি না।

রেবতী উত্তর করে—আমি সরকারকা এবং নারায়ণদা যা বলবে তাই করব।

—আচ্ছা, ঠিক আছে।

নারায়ণ বাঘের মতো চীৎকার করে ওঠে—খগ না....

খগেনও বলে—দেখা যাবে ...

রেবতী প্রচণ্ড রাগের সঙ্গে বলে—আমাদের কিছু ক্ষতি হলে সহজে ছেড়ে দেব না।

নারায়ণের রাগ আরও বেড়ে যায়। আসরের মধ্যে বেশ উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। কারণ অধিকাংশ লোকই নারায়ণ-রেবতীর বিরোধী।

রেবতী কথা বলতে লাগলে সরকার উহার মুখের দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে থাকে এবং তার মুখের মধ্যে একটা মৃদু হাসি ফুটে ওঠে।

আসরের লোকজন স্তম্ভিত হয়ে যায়।

বলাই বাগ্দী বলে—সরকার, তোমার ব্যাপার-স্যাপার কিছুই বুঝতে পারছি না!

সরকার বলে—রেবতীর অবস্থা একটু বোঝ।

ভুপেন উঠে বলে—ঠিক বুলছ, ওর স্বামী ওকে তেড়ে দিয়েছে। ওকে বাঁচতে হবে তো।

নারায়ণ তাড়াতাড়ি বলে—সরকারকা, যে যা বলুক, আমরা মহিলা সমিতি গড়বই। আর কুঞ্জ ও ঝাঁপাবালাকে সঙ্গে নেব।

—কুঞ্জ মানে, শেতল পুকুরের পাড়ের?

—হ্যাঁ।

—ঠিক আছে। তবে ঝাঁপা আসবে কি?

—কেন আসবে না?

—ঠিক আছে, দেখা যাক।

কথা পাকা হওয়ার পর সরকার আসর ত্যাগ করে। নারায়ণও রেবতীকে পৌঁছে দিয়ে বাড়ী ফেরে।

।। নয় ।।

কালো আকাশ ভেদ করে সূর্য ওঠে। তবে আকাশে টুকরো টুকরো মেঘ থাকায় সূর্য মাঝে মাঝে ঢাকা পড়তে থাকে। সকাল শুরু করে তাদের দিনের কাজ। ভূপেন লাঙ্গল নিয়ে মাঠে যাওয়ার পথে সরকারের সঙ্গে দেখা হওয়ায় লাঙ্গল নামিয়ে প্রণাম করে।

সরকার ভূপেনকে চা খেতে বলে। ভুপেন চা খায় না। ভুপেন বলে—তোমার সঙ্গে একটো কথা ছিল।

—কি কথা? বল।

—এই কালকা সাঁঝ বেলায় আমার ঘরের কানঠায় হালদার আর ফটিক ফিস্‌ফিস্ করে বলছিল, ওরা রেবতীদের ঘরে আগুন লাগাবে। নারায়ণ সম্বন্ধেও অনেক কথা বলছিল। ওরা নারায়ণকে খুন করবে। সরকার মশাই, তোমার পায়ে ধরছি, এ কথা যেন কাউকে বলো না।

—না-না, তোর ভয় নাই। কেউ শুনবে না।

—দেখ, যেন····।

এই বলে ভুপেন লাঙ্গল নিয়ে মাঠে চলে যায়।

ফটিক টাকার গোলাম। পেটে ভুক লাগলে সব কিছু করতে পারে সে। তার পেশা হল টাকা নিয়ে মানুষের সর্বনাশ করা। কিন্তু হালদার!

চালে কটাই-বা খড় আছে। পোড়াতে কতটুকুই-বা সময় লাগবে।

গভীর চিন্তায় মগ্ন সরকারের চা শেষ হয়ে যায়। কিন্তু চিন্তার আগুন নেভায় না।

কিছুক্ষণের মধ্যে নারায়ণ ও রেবতী সরকারের বাড়ীতে এসে উপস্থিত হয়। নারায়ণ বাড়ীর দরজার কাছে এসে ডাক দেয়— সরকারকা, ও সরকারকা।

সরকার ডাক শুনেই বাইরে আসে—বাঃ, এসেছিস। ঠিক আছে, চল, ঝাঁপা আর কুঞ্জের কাছে।

দুই জনেই বিধবা। একজন বাল বিধবা। তবে একজন বহু পুরুষের মন জয় করে শেষ বয়সে ভিক্ষার ঝুলি ধরেছে। এদের বাড়ীর দিকে সরকার রওনা হয়।

যেতে যেতে সরকার বলে—মা রেবু, একটু সাবধানে থাকিস।

—সাবধানে কি আর থাকব? লোকে বহু কথা বলে। আমি এখন বেহায়া।

—যাক, তবু সাবধানে থাকিস।

—ঠিক আছে।

গুন গুন করে গান করতে করতে সরকার এগোয়। কিছুক্ষণ পর আবার বলে—আচ্ছা নারায়ণ, তুই যে ছেলেদের নিয়ে গ্রামে সংগঠন করেছিস, তারা সব ঠিক আছে তো?

—কাকা, এখন এ সমস্ত কথা বলছ কেন?

– না, মানে এমনিই বলছি। সব ঠিক আছে তো?

—সবাই কি ঠিক থাকে, মুখে হয়ত বলে ঠিক আছি। কাজে কেউ নাই, সব সময় পয়সার ধান্ধা।

—হ্যাঁ নারায়ণ, সংসার বড় কঠিন রে।

তারা গন্তব্য স্থলে এসে পেঁছায়। কুঞ্জ তাদের দেখে অবাক হয়ে যায়। মাদুর পেতে সহস্র সম্বর্ধনায় ভূষিত করে। তারপর চায়ের জল বসাতে গেলে সরকার নিষেধ করে। সরকার নারায়ণকে বলে ঝাঁপাকে ডাকতে।

নারায়ণ ঝাঁপাকে ডেকে আনে। ঝাঁপা তো অবাক হয়ে যায়।

—ব্যাপার কি?

সরকার বলে—বস ঝাঁপুরাণী। তারপর বলে—আমরা গ্রামে একটা মহিলা সমিতি গড়ছি রেবতীর পরিচালনাধীনে।

ঝাঁপা কুঞ্জের মুখের দিকে তাকায়। তারপর বলে—এ বিষয়ে আমার কিছু জানা নাই।

নারায়ণ বলে—তোমাকে কিছু জানতে হবে না। তুমি কেবল রেবুর সঙ্গে থাকবে। আমরা সব কিছুই করব।

কুঞ্জ বলে—প্রথমে কি করতে হবে?

সরকার বলে—প্রথমে একটা সভা করব। সেই সভায় রেবতীকে বক্তৃতা দেওয়া করাব। অবশ্য আমি সব ঠিক করে দেব।

কুঞ্জ একটু হাসে—বিষয়টি তো বেশ সুন্দর।

সরকার বলে চলে—আমাদের নষ্ট সমাজে নারীদের যেমন ত্রুটী আছে, তেমনি কিছু কর্তব্যও আছে। যেমন, গণেশের মেয়ে কি রকম ভাবে সেজে বেড়াছে। নতুন পোষাকে ছেলেদের মন আকর্ষণ করছে।

কুঞ্জ আর নিজের কথা চেপে রাখতে পারে না।

—দেখ, আঠার বছর বয়সে বিধবা হয়ে ক' বিঘা জমির উপর নির্ভর করে হরির নাম নিয়ে দিনপাত করছি।

কথা কয়টি বলার পর সে চোখ মোছে। তার চোখের জল দেখে রেবতীও চোখ মোছে। ঝাঁপা ফেলে আসা জীবনের দিকে তাকায়। তার চোখ অশ্রুপূর্ণ হয়ে ওঠে।

কুঞ্জ বলে—সরকারদা, আমার দ্বারা যতটুকু হয় করব।

সরকার ঝাঁপার দিকে তাকিয়ে বলে—ঝাঁপা, তোর মত বল।

ঝাঁপা ঘাড় নেড়ে মুচকি হাসে। তারপর বলে—কুঞ্জদি যা করবে আমিও তাই করব।

কুঞ্জের বয়স পঞ্চাশের উপর। ঝাঁপার পঞ্চাশের কাছাকাছি।

কুঞ্জ তার স্বামীর মৃত্যুর পর শ্বশুর বাড়ী ত্যাগ করে এসেছে। শ্বশুর বাড়ীর পাওয়া সম্পত্তি বিক্রি করে বিক্রমপুরে কিছু জমি কিনেছে, এতেই সংসার চলে যায়। আর ঝাঁপা স্বামীর স্নেহ মমতা থেকে বঞ্চিত হয়ে বেছে নিয়েছে ভিক্ষার পাত্র।

নারায়ণ এই স্ত্রীলোক দুটি সম্পর্কে সবই জানে। মানুষ হিসাবে তারা সত্যই ভালো। গ্রামের মধ্যে নারায়ণ-রেবতী সম্পর্কে যে কানা-ঘুষো শুরু হয়েছে, এতে স্ত্রীলোক দুটির কোন মাথা ব্যথা নেই। তাই এই স্ত্রীলোক দুটিকে তারা বেছে নিয়েছে।

বেশ কিছুক্ষণ পর সরকার ওদেরকে বসতে বলে রাস্তা ধরে। নারায়ণ এবং রেবতীও সরকারকে অনুসরণ করে।

ঝাঁপা কুঞ্জের কাছ থেকে একটু দূরে বসে। কেননা সে নীচু বাগ্দী জাতি। কুঞ্জ চ্যাটার্জী ব্রাহ্মণের মেয়ে, জপ আহ্নিক করে। আর ঝাঁপা এখানে সেখানে ঘোরে, ভিক্ষা করে। ছোঁয়া পড়লে হয়ত স্নান করতে হবে।

সকলে চলে যাওয়ার পর ঝাঁপা কুঞ্জকে জিজ্ঞাসা করে—কুঞ্জদি, তুমি যাবে?

কুঞ্জ বলে—তাতে দোষ কি? আর সরকারদা যখন বলল তখন কি আর না করা যায়।

—তা, তুমি কি করে যাবে? তোমার ঘরে ঠাকুর আছে, গ্রামে সমিতি করবা কি করে?

—আ মর, তাতে কি হবে?

—আমাদের জি ছোঁয়া পড়বে।

—ওরে, দেশের কাজে দোষ নাই।

ঝাঁপা উঠে দাঁড়ায়—আমাকে আবার গাঁ বেড়াতে হবে।

এদিকে নারায়ণ যেতে যেতে বলে—সরকারকা, অনেক দিন তো

হল চিঠি দিলাম কিন্তু কোন উত্তর পেলাম না।

রেবতীর মুখটা লজ্জায় কুঁচকে যায়। কারণ সে চিঠির ব্যাপারটা জানত।

সরকার বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে বলে—ওর কি মনুষ্যত্ব আছে ?

রেবতী নারায়ণের গায়ে চিমটি কাটে। নারায়ণ চুপ করে যায়।

রাস্তা ফুরিয়ে আসে। সরকার উহাদেরকে বিদায় দিয়ে নিজের ঘরে যায়। নারায়ণ রেবতীকে পৌঁছে দিতে চলে। রাস্তায় অনেক লোকের সঙ্গে দেখা হয়। কেউ কথা কয়, কেউ মুচকি হাসে, রস অনুভব করে।

তারা কুড্ডা পুকুরের বটতলায় উপস্থিত হয়। সেখানে দাঁড়িয়ে থাকা কতগুলো মেয়ে নারায়ণ-রেবতীকে দেখে হাসিতে লুটিয়ে পড়ে। রেবতীরা তাদের না দেখার ভান করে চলে যায়। কিছুদূর যাওয়ার পর তাদের কানে আসে—সর্বনাশী, গাঁ কে নষ্ট করবে। কপালপুড়ীর মরণ নাই, পুরুষ মানুষের সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

কথাগুলো তাদের কানে যাওয়ার পর উভয়ে উভয়ের দিকে তাকায়। রাস্তাও ফুরিয়ে আসে। রেবতী ঘরে চলে যায়, নারায়ণও তার রাস্তা ধরে।

ঘরে ঢোকা মাত্রই শৈলদাসী ফোঁস করে ওঠে—কপালপুড়ি, কোথায় ছিলিস ? আমাকে পরের ঘরে কাজ করতে যেতে হবে না ? পিণ্ডি রাঁধবি না ? খাবি কি ?

রেবতী বিরক্ত হয়ে বলে—তু যা করছিস করগা। আমার ভাবনা ভাবতে হবে না।

—তবে তোর যা মন চায় তাই করগা। এই লে চাবি।

—ঘরে তোর হীরে-জহরত ভরা আছে। চাবি দিয়ে যেছে। দেখে বাঁচি না।

শৈল চলে যায়। রেবতী কিছুক্ষণ বসে থাকার পর রান্না শুরু করে। রান্নার কাজ শেষ হতে বেশ সময় লেগে যায়।

রেবতী স্নান করে ভাত অম্বল খেতে যাবে এমন সময় শৈল এসে উপস্থিত। ঠিক দুজনের খাওয়া শেষ হবে এই মুহূর্তে নারায়ণ এসে হাজির হয়।

নারায়ণকে দেখে শৈল বসতে বলে। তার মুখে বেশ বিরক্তির ভাব ফুটে ওঠে। নারায়ণ বুঝতে পারে যে শৈল তাকে পছন্দ করছে না। অবশ্য নারায়ণ শৈলর দিকে দৃষ্টি না দিয়ে রেবতীকে তার আসার উদ্দেশ্য বলে। রেবতী রাজী হয়ে যায়। রেবতী তার মাকে কোন কথা না বলেই বেরিয়ে পড়ে।

দুজনে তাদের বোঝাপড়া মতো ঝাঁপাবালার বাড়ী যায়। তবে রাস্তায় যেতে যেতে নারায়ণ রেবতীকে জিজ্ঞাসা করে—তোর মাকে আজ যে কি রকম লাগছিল?

—মা আমার ঘোরাঘুরি পছন্দ করছে না।

রেবতী কথা বলতে বলতে হঠাৎ যেন বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে—আমাকে সারা জীবন বন্দী থাকতে হবে? আমার পথ আমাকে খুঁজে বের করতে হবে না? মানুষকে ভালবাসার অধিকার আমার নাই?

—রেবতী! রেবতী ত্যাখ, আমার দিকে তাকা।

তারপর দুজন দুজনের চোখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে। রেবতী মুচকি হাসে।

রাস্তা ফুরিয়ে আসে। ঝাঁপা সবে রান্না সেরেছে। নারায়ণ আর রেবতীকে দেখে সে আনন্দে আত্মহারা হয়ে যায়।

তাড়াতাড়ি ছেঁড়া চট দুটো পেতে দিয়ে বলে—রাধাকৃষ্ণের নাম নিয়ে দুটো করে সেবা হয়ে যাক।

নারায়ণ তাড়াতাড়ি বলে—না-না, আমরা খেয়ে এসেছি।

ঝাঁপার মুখটা একটু মলিন হয়ে গেল। কারণ সে জাতিতে বাগ্দী। অবশ্য রেবতী-নারায়ণ জাতপাতের ধার ধারে না।

ঝাঁপা রেবতী-নারায়ণকে আর অনুরোধ না করে পুজো-আহ্নিক

সেরে খেতে বসে।

রেবতী-নারায়ণ বসে থাকে। ঝাঁপার খাওয়া শেষ হলে জিজ্ঞাসা করে—কি ব্যাপার, ভাই ?

নারায়ণ বলে—না, তেমন কিছু নয়। তোমার কাছে এমনি বেড়াতে এলাম। তোমার এই জায়গাটা বেশ ভালো লাগে।

—আমাদের জায়গা তো নীরস।

নারায়ণ ও রেবতী হেসে ওঠে। তারপর নারায়ণ বলে—তোমাদের কাছেই বেশী রস।

রেবতী মিচকি হাসে। ঝাঁপা রেবতীর দিকে তাকায়। দুজনের মধ্যে চোখে চোখে কথা হয়।

বেশ কিছুক্ষণ কেটে যাওয়ার পর নারায়ণ বলে—আর বসব না।

সন্ধ্যা নেমে আসে। আকাশ কালোয় ঢাকা পড়তে থাকে। নারায়ণ এবং রেবতী বেরিয়ে পড়ে। রাস্তায় আসতে আসতে নারায়ণ বলে—আজ আসরে যাস।

—আমি আজ যাব না।

—ঠিক আছে, আমিও যাব না। আমার ক্লাবে একটা দরকার আছে।

—কি দরকার ?

—মহিলা সমিতির ব্যাপারে।

—এতে সকলে তোমাকে ঠাট্টা-তামসা করবে।

—তাতে ভয় কি ? ও তো মুখের কথা, গায়ে তো ফোসকা পড়বে না। তবে তোকে থাকতেই হবে।

—আমার আর ভয়-টয় নাই। আমি সব সময়েই আছি।

—যদি সন্তুবাবু তোকে নিতে আসে, যাবি না ?

রেবতী একটু রেগে ওঠে—যে অপমান নিয়ে এসেছি, তার চরম মূল্য তাকে দিতে হবে।

—কথায় বলে স্বামী সুখ।

—আমি ভাল করে জেনেছি, সেটা আমার কপালে নাই। সে

আমাকে জব্দ করেছে। লোকে আমাকে আজ দোষ দিছে এইভাবে ঘোরাতে। কিন্তু আমার ভবিষ্যত ?

নারায়ণ আর কোন কথা না বলে রেবতীকে পেঁৗছে দিয়ে নিজের বাড়ী ফিরে যায়।

॥ দশ ॥

রাত বেশ হয়ে আসে। আসবে বেশ কিছু সংখ্যক লোক উপস্থিত হয়। সরকারও উপস্থিত হয়েছে। তার মনটা বেশ খারাপ। মাঝে মাঝে রাগের শিখা বেরোতে থাকে তার মুখ দিয়ে। তার দৃষ্টি খগেন হালদারের আসার প্রতি। তখনও সে এসে পেঁৗছায় নি। এক পাশে বসে থাকা ভূপেনের দিকে সরকার একবার তাকায়। সে ভয়ে জড়সড় হয়ে আছে।

সরকার বেশ কিছুক্ষণ দেখার পর দেখে হালদার এলো না। তার সন্দেহের বাঁধ ভেঙে যায়।

ভূপেন বলে—সরকার মশাই, খানিক পড়লে হতো না ?

—না, আমার আজ শরীর খুবই খারাপ। বয়স হয়েছে তো।

—কত হবে ?

—তা তিন কুড়ির ওপর।

হঠাৎ নারায়ণ এসে উপস্থিত হয়। সরকার চমকে ওঠে।

—কিছু ব্যাপার হয়েছে নাকি ?

—না, তেমন কিছু না। এমনি এলাম।

—রেবতী ঠিক আছে তো ?

—হ্যাঁ।

এদিকে হালদার আসরে আসে নি। সরকার তো ঠিক বুঝতে পারে ভূপেনের কথা মিথ্যা নয়। সে অসুস্থতার ভাণ করে আসর ছেড়ে চলে আসে। নারায়ণও ব্যাপারটা বুঝতে পারে না।

রাত বেশ হয়। গ্রাম নিস্তব্ধ হয়ে যায়। হালদারের কাছে ঠিকা স্বরূপ একশ টাকা নিয়ে ফটিক চলে আগে আগে, হালদার পিছনে পিছনে।

হালদার রেবতীর ঘর পুড়িয়ে ছাই করে দেবে! অগুনের লেলিহান রসনা দাউ দাউ করে জ্বলে উঠবে! শত সমুদ্রের জলও সেই আগুন নেভাতে পারবে না! এতে হালদারের সব আশা পূরণ হয়ে যাবে! হালদার এক দুঃসাহসিক অভিযানে নেমেছে। কিন্তু এই অভিযান যে কত ভয়াবহ, ভাবলে অবাক হতে হয়।

ফটিক তার ঠিকা পুসিয়ে দেয়। সে পাটের কাঠিতে আগুন ধরিয়ে রেবতীদের ঘরে লাগিয়ে দেয়। তারপর দুজনে ছুটে পালায় ঘোর অন্ধকার পথের উপর দিয়ে। রেবতীদের ঘরের আলোতে তাদের যাওয়ার পথ আলোকিত না হয়ে বরং আরও অন্ধকার হয়। তারা ছুটে গিয়ে তাদের বাড়ীতে যেয়ে শুয়ে পড়ে, যেন কেউ তাদের সন্দেহ করবে না।

আগুন হু-হু করে জ্বলে ওঠে। ফলে ঘরটি ধোঁয়ায় পরিপূর্ণ হয়ে যায়। ঘুমিয়ে থাকা শৈলর ঘুম ভেঙ্গে যায়। সে তাড়াতাড়ি উঠে দেখে সর্বনাশ। তখন সে কনুই দিয়ে ঘুষিয়ে রেবতীকে ঘুম থেকে তোলে। তারপর বহু কষ্টে ঘরের বাইরে আসে।

শৈল-রেবতীর চীৎকারে গ্রামের শত শত মানুষ এসে হাজির হয়। তারা জল দিয়ে আগুন নেভাতে থাকে। এদিক উন্মত্ত বাঘের মতো নারায়ণ এসে উপস্থিত হয়। সকলের ঐকান্তিক চেষ্টায় আগুন আয়ত্তে আসে। সর্বনাশা অগ্নি নিঃস্ব করে দেয় রেবতীদের। সর্বনাশা আগুনের লেলিহান শিখা কিছুটা স্তিমিত হতে থাকলে সরকার মশাই উপস্থিত হয়। শৈল তার পায়ের তলে পড়ে যায় এবং কান্না শুরু করে। রেবতীর গগন ফাটা চীৎকার সরকারের অন্তর আর্দ্র করে।

সরকার সান্ত্বনার কোন বাণী না দিয়ে লাঠি ঠুকে জোরের সঙ্গে বলে—এ কাজ হালদারের, আমি কিছুটা শুনেছিলাম।

কথাটা শুনে নারায়ণ লাফিয়ে ওঠে, তারপর ছুট দেয় হালদারের ঘরের দিকে। তার পিছু পিছু ছোটে কয়েক শ' লোক।

নারায়ণ হালদারের বাড়ীর সামনে দাঁড়িয়ে ডাক দেয়—হালদারদা, ও হালদারদা....

বেশ কয়েক বার ডাকের পর তার স্ত্রী উত্তর দেয়—জ্বর হয়েছে।

তা অবশ্যই ঐ মহাপ্রভুর শেখানো।

নারায়ণ বলে—ডেকে দ্যান, দেখা করে চলে যাব।

অনেকক্ষণ এই ভাবে কথা বলার পর হালদার দেখে, তার উপর সন্দেহ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। তখন অসুখের ভাণ করে হালদার নেমে আসে।

নেমে আসা মাত্রই হালদারের কলার চেপে ধরে নারায়ণ বলে—চল, সরকারকা ডাকছে।

হালদার রেগে আগুন হয়ে যায়। সকলে বলে ওঠে—চল, তোকে দেখছি গা।

হালদারের স্ত্রী পরমার কৌতূহল বেড়ে যায়—কি ব্যাপার?

এই বলে সে চীৎকার করে ওঠে। কেউই তার কথা শোনে না। হালদারকে টানতে টানতে নিয়ে আসে সরকারের কাছে।

দাঁড়িয়ে থাকা মাতন বাগ্দী বলে- ওকে ঐ আগুনে ফেলে দাও।

এ কথা শুনে খগেন হালদার আঁৎকে ওঠে।

সরকার কলার ধরে বলে—চোখের জল ফেলে জীবনে সুখ আনা যায় না রে, খগ্না।

খগেন চীৎকার করে বলে— সাবধান! আমি কিছুই জানি না।

নারায়ণ রেগে গিয়ে তার বুকে একটা ঘুঁসি মেরে বলে—খুব বেড়ে গেছিস, না!

খগেনের রাগ উত্তরোত্তর বেড়ে যায়। সে চীৎকার করে ওঠে। আগুন কিছুটা স্তিমিত হয়ে আসায়, অধিকাংশ লোক আগুনের কাছ

থেকে সরে এসে হালদারকে ঘিরে দাঁড়ায়।

সরকার বলে—দে, ব্যাটাকে আগুনে ফেলে দে।

বেশ কয়েকজন লোক তাকে তোলাতুলি করে নিয়ে যেতে থাকলে হালদার জোড় হাত করে বলে—আমাকে আগুনে ফেলিস না, আমি সব বলছি।

সরকার বলে—বল্, কি ব্যাপার ?

—আমি ফটিককে দিয়ে পুড়িয়েছি।

—ধরে নিয়ে আয় ফটিককে।

বলে সরকার সপাং করে লাঠির এক বারি মারে হালদারের পিঠে। বেশ কিছু লোক ছুট দেয় ফটিকের বাড়ির দিকে। নারায়ণ সরকারের হাত থেকে লঠিটা নিয়ে বারির পর বারি মারে হালদারের পিঠে। হালদার মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। পরমা চেপে ধরে নারায়ণকে।

রেবতী পোড়ে না। হালদার তাকে পোড়াতে পারে না। হালদারের দোষ প্রমাণিত হয়ে যায়। সে তখন ক্ষমার পাত্র।

জনতা ফিরে আসে। ফটিক গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে গেছে। সকলে হালদারকে শুরু করে প্রহার। পরমা সরকারের পায়ে ধরে।

—আমার সব গয়না দিয়ে দেব। 'ওকে' ছেড়ে দ্যান।

শৈল তাকে অশ্লীল ভাষায় গাল দিতে থাকে। রেবতী নারায়ণকে পাশে ডেকে বলে—আমি পরমার কান্না দেখতে পারছি না। ওকে ছেড়ে দাও।

নারায়ণ রেবতীর কথা শুনে সরকারের কানে কানে কি যেন ফিস্-ফিস্ করে বলে। সরকার সকলকে থামতে বলে।

তারপর খগেনকে বলে—তোকে এই ঘর করে দিতে হবে।

—হ্যাঁ, আমি করে দেব।···আমি সব ঠিক করে দেব।

আগুন নিভে যায়। গ্রামের লোকেরা আস্তে আস্তে ঘরে ফেরে।

সরকার উচ্চৈস্বরে চীৎকার করে বলে—আমার রেবতীকে ওরা পুড়িয়ে মারতে পারবে না। খগেনের মনে যে অহংকার এসেছিল তা ধুলায় লুটিয়ে গেল, ঐ আগুনে ও নিজেই পুড়ল। গ্রামে ওর মাথা

হেঁট হয়ে গেল। এর চেয়ে বেশী আর কি শাস্তি হতে পারে?

তারপর সরকার নারায়ণকে বলে—তু এক কাজ কর, আজকে রাতের মতো রেবতী আর শৈলকে ক্লাবে নিয়ে যা।

ওদের সব ব্যবস্থা করে সরকার বাড়ী ফেরে। নারায়ণ ওদের নিয়ে ক্লাবে যায়। ক্লাবে ঢুকে শৈল হু-হু করে কেঁদে ওঠে।

—বাবা নারায়ণ, এ কি সর্বনাশ হল? কাল কি খাব, বাবা?

—তুমি কিচ্ছু ভেবো না মাসী, কালকে সব ঠিক হয়ে যাবে। এখন তোমরা ঘুমাও।

—দেখিস বাবা, আমাদের তো চোখের জল ছাড়া কিছুই নাই।

রেবতী গুমরে গুমরে কাঁদতে থাকলে নারায়ণ বলে—তোর অত কি চিন্তা? খগেন সব ঠিক করে দেবে।

শৈল বলে—তুই বাড়ী যাবি না?

—না, তোমাদের আগলাব।

নারায়ণ ওদের ঘুমোতে বলে বাইরের বারান্দায় পাইচারী করতে থাকে। আর ভাঙা ভাঙা গলায়—"তব দয়া দিয়ে হবে গো"....এই গানটি গাইতে থাকে।

মাঝে মাঝে ঘর থেকে শৈলজা তাকে শোবার জন্য বলে। কিন্তু নারায়ণ পাইচারী করতে থাকে।

আস্তে আস্তে অন্ধকার সরতে থাকলে হালদার দুটো মুনিস পাঠিয়ে দেয়। তারা দ্রুত কাজ করে সমস্ত পরিষ্কার করতে থাকে।

এদিকে সকাল হলে রেবতীরাও এসে উপস্থিত হয়। শৈল হালদারকে অভিশাপ দিতে থাকে। সরকারও বেশ কিছু চাল, ডাল, তরকারী নিয়ে উপস্থিত হয়।

সরকার বলে—তোদের কোন চিন্তা নাই, সব ব্যবস্থা করে দেব।

নারায়ণের চোখ ঘুমে জড়িয়ে আসছে দেখে বলে—তু বাড়ী যা, আমি দেখছি।

নারায়ণ বাড়ী চলে যায়।

সরকার লাঠি ঠুকে বলে—খগেন মনে করেছিল ডুবে ডুবে চলে যাবে। দ্যাখ এবার, কত জলে কত মসুরী সেদ্ধ হয়। সব কিছু করে দিতে হবে। জরিপনা দিতে হবে।

রেবতী বলে—দিতে পারবে ?

—সব দেবে বলেছে, না হলে জেলে থাকবে।

যে মুনিসগুলো কাজ করছিল, তারা বলে—টাকা পয়সা নিয়ে সে আসছে।

বলতে বলতে খগেন এসে উপস্থিত হয়।

সরকার চীৎকার করে বলে—খগনা, টাকা না দিলে তোর খালাস নাই।

খগেন বলে—সব ব্যবস্থা করে দিছি, আপনাদের কোন চিন্তা নাই। একটু ধৈর্য ধরুন। ভুল যখন করেছি, মাসুল গুনবই।

॥ এগার ॥

দেবকীর স্বামীর শ্রাদ্ধ-কর্ম হয়ে যায়। আগের পক্ষের ছেলে-মেয়েরা সব সম্পত্তি দখল করে নেয়। তাই এক অবাঞ্ছিত অতিথির মতো সে থাকতে চায় না। সে বেরিয়ে পড়ে মনোমোহনের সঙ্গে বিক্রমপুরের দিকে। মনোমোহন শত চেষ্টা করেও সম্পত্তির বিষয়ে কিছু করতে পারে না। কারণ সম্পর্কে সে দেবকীর কাকাশ্বশুর।

হরকালী নিজেকে কিছুটা বুঝিয়েছে। আবার সেই দুঃখটাকে খুঁচিয়ে তোলার জন্য দেবকী আসছে। না আসলেও তার উপায় নেই। কারণ শ্বশুর বাড়ীতে এখন আর তার স্থান নেই।

বেলা ১২টা। চনচনে রোদে সারা আকাশ বেশ গরম। হরকালী

মাদুর পেতে চুপ করে শুয়ে আছে। অনেক দিন পর দেবকী চোখের জল ফেলে ঘরে ঢোকে।

হরকালী চমকে ওঠে। দেবকীর কান্নায় এ-ঘর ও-ঘর সমস্ত ঘর পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। হরকালী মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। মনোমোহন তাড়াতাড়ি হরকালীকে তুলে বসায়।

কান্নার শব্দে ছুটে আসে প্রতিবেশীরা।

পাড়ার মেয়েরা দেবকীকে সান্ত্বনা দিতে থাকে। হরকালী মাঝে মাঝে চীৎকার করে ওঠে— দেবু রে, মরিস্ নি, এখনও মরিস্ নি।

দেবকীর মৃত্যু না হলেও সধবা দেবকীর মৃত্যু হয়েছে। তার দেহে বৈধব্য রেখা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সরু কালো পাড় শাড়ী পরে দেবকী আঙিনায় প্রচুর ধূলো মাখে। কিন্তু হতাশার গর্ভে কোন শান্তি জল পড়ে না।

খবর গ্রামের এক প্রান্ত হতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। সুফল হাজরা সরকারকে খবরটা দেয়।

—কি সরকার মশাই, শোন নি? দেবকী আসছে।

সরকার চমকে ওঠে—তাই নাকি!

দেবকীকে কয়েকজন মহিলা ধরে বসে আছে। তাকে জল খাওয়াচ্ছে। কিন্তু দেবকীর হৃদয় সাহারা সেই জলে সিক্ত হচ্ছে না।

সরকার উপস্থিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেবকী আবার কেঁদে ওঠে। হরকালীও চীৎকার করে ওঠে— ওরে দেবু রে, মরিস্ নি ··

সরকার আর চোখের জল ধরে রাখতে পারে না। আকাশের দিকে তাকিয়ে সেও হু-হু করে কেঁদে ওঠে।

সরকারের কান্না দেখে হরকালী উন্মত্তের মতো চীৎকার করে ওঠে —সব মিথ্যা, ভগবান মিথ্যা, হরিগাছ মিথ্যা···

দেবকীর চোখের জলের ভাগ নিতে রেবতী এসে উপস্থিত হয়। দেবকীর গলা জড়িয়ে ধরে রেবতী কান্নায় ফেটে পড়ে। অন্যান্য মেয়েরা উঠে দাঁড়ায়। কারণ তাদের সুদৃষ্টি নেই রেবতীর প্রতি, তাই তারা সরে দাঁড়ায়।

সেই মুহূর্তে একজন বলেই ফেলে—সেই ছোঁড়াটো কই ?

রেবতী সে কথায় কান না দিয়ে দেবকীর সঙ্গে সুর মেলায়।

এদের দুঃখ ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। অন্তর দিয়ে অনুভব করতে বিশাল জনসমুদ্রকে দয়িত্ব দিলাম। সকল মানুষ, পাঠক তাদেরকে কুড়িয়ে নিয়ে চোখের জলের মর্যাদা দেবে নিজের হৃদয়ে অনুভব করে। দেবকী বিশাল সমুদ্রে গলা পর্যন্ত ডুবিয়ে চীৎকার করছে। মানুষ, পাঠক কি এই ডুবন্ত মেয়েটিকে তুলে বাঁচাবার ব্যবস্থা করবে না ?

বেশ কিছুক্ষণ চোখের জলে ভেসে যাওয়ার পর রেবতী দেবকীকে বলে—চুপ কর্ দেবু, আমার দিকে একবার চেয়ে গ্যাখ।

কিন্তু দেবকী কোন কথা শোনে না।

—দেবু, কিছু খাবি না ?

—না, আমি এখন কিছু খাব না।

রেবতীর সহানুভূতিতে তার হৃদয় পাওয়া যায়। অন্যান্য অনেক মেয়ে এসেছিল, তারা দেবকীর প্রতি অনেক সান্ত্বনার বাণী ছুড়েছে। তাদের চোখে জল ছিল. কিন্তু সে জলের স্বাদ বোঝা যায়। তবে রেবতীর ভালবাসা পরিমাপ করা যায় না। তার চিন্তা ভবিষ্যৎ গঠনের, মজা দেখার নয়।

॥ বার ॥

নারায়ণ রেবতীকে ডেকে নিয়ে যায় ক্লাব ঘরে। ঝাঁপা আর কুঞ্জও এসে উপস্থিত হয়। সরকার সেখানে অপেক্ষা করছিল।

সরকার বলে—রেবতী, আজকেই মহিলা সমিতির সভা হবে। এবং তোকে বক্তৃতা দিতে হবে।

—ও আমি পারব না।

—আরে আমি লিখে দেব তুই মুখস্থ বলবি।

ঝাঁপা বলে ওঠে—এ আবার কি কঠিন!

ত্রিভঙ্গ সরকার বলে—পারবি পারবি, ঠিক পারবি। তবে তোদের কাছ থেকে কিছু জিনিষ আমাকে জানতে হবে। ....আচ্ছা নারায়ণ, দিনটা কবে করা যায় বল তো?

—আগামী তেসরা বৈশাখ করে দাও।

—আজকে তো পয়লা, তাহলে একদিন পর। ঠিকই বলেছিস, তাড়াতাড়ি করাই ভাল। তুই গ্রামে ঢোল দিয়ে দে।

—আমি সব ব্যবস্থা করছি।

—একটা সুষ্ঠু পরিবেশে আমরা সভাটা করব।

একটু পর সরকার বলে—সবাই দেখে যা কি লিখছি : নারীরা আজ সমাজের বোঝা স্বরূপ। জন্মানোর পর তারা পিতামাতার বোঝা স্বরূপ। অর্থের দারুণ অভাবে পড়তে হচ্ছে মহাসাগরে। যেমন দেবকী পড়েছে। তার চোখের জল শেষ হয়ে যায়। কিন্তু কেন? কোথায় চেতনা? প্রগতিশীল সমাজ ব্যবস্থায় সমাজের ভিতর থেকে কোথায় বিপ্লব? কেন নারীদের পঙ্কিল পিচ্ছিল পথে যেতে হচ্ছে?....

সরকার পড়তে পড়তে থেমে যায়। রেবতীর দিকে তাকিয়ে বলে—আচ্ছা রেবতী, তোকে তো তোর স্বামী জব্দ করতে চেয়েছিল। কিন্তু তোর সতীনের ব্যবহার কেমন ছিল?

—সতীনের ব্যবহার কি ভাল হয়? সে আমার সব অধিকার কেড়ে নিয়েছে। আমার ভবিষ্যত আশায় জল ঢেলে দিয়েছে।

সরকার 'হুম্' বলে আবার পড়া শুরু করে : মানুষের মনুষ্যত্বের পরাজয় ঘটলে সংসারের সুখ বিসর্জিত হয়। স্বার্থ সমস্ত ভাল পথ বন্ধ করে দেয়। হিংসা, আত্মকেন্দ্রিকতা কি মানুষ ফেলে দিতে পারে না? সত্যই আমি আজ আপনাদের ঘৃণার পাত্রী। কিন্তু কেন? আজ আমাকে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে হচ্ছে কেন?... বাঁচার জন্য।

আপনাদের কংক্রীটে তৈরী ঐ প্রাচীর ভাঙার জন্য। বলুন তো, আমি যদি ভাল স্বামী পেতাম, তা হলে কি এখানে আসতাম? তবে আমি মৃত্যু দিয়ে বাঁচার রাস্তা তৈরী করতে চাই না, আমি পরিবর্তনের মধ্য দিয়েই এগোতে চাই।

বাধা দিয়ে সকলে বলে ওঠে—চমৎকার!

—আচ্ছা কুঞ্জ, ঝাঁপা?

দুজনে বলে-- আমরা আর কি বলব?

—তাহলে শোন: আচ্ছা, আপনারা তো অনেক বাল্য বিধবা দেখেছেন, কিন্তু তাদের বুকে কান লাগিয়ে শুনেছেন কি তাদের কত যন্ত্রণা? আমি তাই সংস্কারের বুকে আঘাত হানতে চাই। তবে নারীদের যেমন সংযমের প্রয়োজন, পুরুষদেরও তেমনি এগিয়ে আসা দরকার। আর সেই আসাটা হবে স্বার্থ নিয়ে নয়, হৃদয় নিয়ে।

কথাগুলো শোনার পর কুঞ্জের চোখে জল আসে। রেবতী তাকায় দূর আকাশের দিকে।

এমন সময় প্রভাকর এসে উপস্থিত হয়।

সরকার বলে—বস প্রভাকর, বিপ্লব কোথা?

—ও সব জানে, ও আসবে।

—সহযোগিতা করবি তো?

— না করলে আসতাম না।

—বিপ্লব?

—ও ঠিকই আছে।

গ্রামে ঢোল পড়ে যায়। তেসরা বৈশাখ মহিলা সমিতির মিটিং। প্রধান বক্তা রেবতী।

গ্রামের মধ্যে বেশ উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। সকলের মুখে মুখে ফেরে—নারায়ণ আর রেবতী গ্রামটাকে নষ্ট করলে। তার সঙ্গে ঐ বুড়ো সরকার যোগ দিয়েছে। কি দিন এল!

বেড়া ভাঙ্গার স্বপ্ন কেউ দেখে না। নিজের দিকে তাকিয়ে সবাই সমুদ্রের সঙ্গে তুলনা করে। ভাবতে চায় না যে আর একটা যুগের

প্রয়োজন। কেউ সে যুগের সূচনা করতে চাইলে দেয় বাধা। কিন্তু প্রয়োজন কি বাধা মানে?

অবশেষে আসে তেসরা বৈশাখ। বেলা তিনটে বাজতেই সুন্দর-ভাবে মঞ্চ তৈরী হয়ে যায়। বহু মানুষ উপস্থিত হয় মজা দেখার জন্য। তবে দেবকী বা বিপ্লবের মতো সুহৃদয়বাবুরা সত্যই প্রয়োজন অনুভব করেই আসে।

সভার কাজ শুরু হয়! নারায়ণ সভাপতির আসন গ্রহণ করার জন্য ত্রিভঙ্গ সরকারের নাম প্রস্তাব করে। সঙ্গে সঙ্গে সরোজবাবু তা সমর্থন করে। পরে নারায়ণ সরোজবাবুকে সভা পরিচালনার দায়িত্ব দেয়।

সরোজবাবু ত্রিভঙ্গ সরকারের তৈরী লিষ্ট অনুসারে প্রথমেই উদ্বোধনী সঙ্গীত গাইবার জন্য ডাকে ঝাঁপাবালাকে।

একখানি গান ঝাঁপার মুখে মুখে সব সময়ই ঘোরে। ঝাঁপা একতারা নিয়ে শিল্পীসুলভ মনোভাবে সেই গানটি আরম্ভ করে –

জীবন যখন ফুরিয়ে গেল
বৃথায় কাঁদিস ওরে,
সকল আশা গুঁজে রাখিস
বৃথায় হৃদয় পরে!
মহৎ প্রেমের হৃদয় মোদের
তা না বুঝে,
দেখছি মোরা পিছন জগৎ
সামনে না খুঁজে।
তাহার পরে গোপন দেশে
যেছি মোরা চলে,
আসবে না তো কেউ রে ভাই
থাকব চিরকাল বলে।

সহস্র সহস্র করতালিতে গানটি শেষ হতেই রেবতীর নাম প্রস্তাব করে। রেবতীর নাম শোনা মাত্রই মেয়েরা এ-ওর মাথায় টোকা মেরে, চিমটি কেটে কৌতূহল প্রকাশ করে।

রেবতীর পা দুটো কাঁপতে থাকে। তবুও নিজেকে শক্ত সমর্থ করে নিয়ে সরকারের দিকে তাকায়, তারপর মঞ্চে ওঠে।

মাননীয় সভাপতি, উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলী ও আমার স্নেহের ভাই এবং বোনেরা

—নারীরা আজ সমাজের বোঝা স্বরূপ। জন্মানোর পর তারা পিতামাতার বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। অর্থের দারুণ অভাবে তাদের পড়তে হচ্ছে মহা সাগরে। যেমন দেবকী পড়েছে। চোখের জল শেষ হয়ে যায় তার। কিন্তু কেন? কোথায় চেতনা? প্রগতিশীল সমাজ ব্যবস্থায় সমাজের ভিতর থেকে কোথায় বিপ্লব? কেন নারীদের পঙ্কিল পিচ্ছিল পথে যেতে হচ্ছে? ..

....আপনারা জানেন, মানুষের মনুষ্যত্বের পরাজয় ঘটলে সংসারে সুখ বিসর্জিত হয়। স্বার্থ সমস্ত ভাল পথ বন্ধ করে দেয়। হিংসা, আত্মকেন্দ্রীকতা কি মানুষ ফেলে দিতে পারে না?

...সত্যই আমি আজ আপনাদের ঘৃণার পাত্রী। কিন্তু কেন? আজ আমাকে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে হচ্ছে কেন? বাঁচার জন্য। আপনাদের কংক্রীট করা প্রাচীর ভাঙার জন্য।...

চোখের জল মুছতে মুছতে রেবতী আবার বলা শুরু করে—

বলুন তো, আমি যদি ভাল স্বামী পেতাম, স্বামী সুখ পেতাম, তাহলে কি এখানে আসতাম? তবে আমি মৃত্যু দিয়ে বাঁচার রাস্তা করতে চাই না। আমি পরিবর্তনের মধ্য দিয়েই এগোতে চাই।..

..আচ্ছা, আপনারা তো অনেক বাল্য বিধবা দেখেছেন, কিন্তু তাদের বুকে কান লাগিয়ে শুনেছেন কি তাদের কত যন্ত্রণা? আমি তাই এই সংস্কারের বুকে আঘাত হানতে চাই। তবে নারীদের যেমন সংযমের প্রয়োজন, পুরুষদেরও তেমনি এগিয়ে আসা দরকার। এবং সেই আসাটা স্বার্থ নিয়ে নয়, হৃদয় নিয়ে।....

....আমার আর কিছু বলার না থাকায় আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি। নমস্কার।

রেবতীর বক্তব্য শেষ হতেই নারায়ণের নাম প্রস্তাব করে সরোজবাবু।

নারায়ণ প্রারম্ভিক সম্বোধনের পর তার বক্তব্য শুরু করে—

—আমরা জানি কোনটা খারাপ কোনটা ভাল। অন্যায় জেনেও পাপ করি, তাই আমরা জ্ঞান পাপী। তাই বড় বড় কথা না বলে কাজ দেখাতে চাই। তাই শত অপমান সহ্য করেও এগিয়ে চলেছি। আমি মনুষ্যত্ব হারাতে চাই না, ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্য বৃহৎ স্বার্থ বিসর্জন দিতে চাই না। আর এও কথা যে পরের চোখের জলে ভাল কাজ হয় না। সকলের কাছে আমার অনুরোধ সমাজকে বোঝার চেষ্টা করুন। আমি আর কিছু বলতে চাই না। নমস্কার।

নারায়ণের পর আসে সরোজবাবুর পালা। কিন্তু সরোজবাবু সরকারের কানে কানে বলে—আমার দ্বারা হবে না।

সরকার একটু হাসে। তারপর বলে—আমার নাম প্রস্তাব কর।

সরকারের নাম প্রস্তাব হতেই সরকার উঠে বলে—

—আমরা সত্যই জ্ঞান পাপী। সারা বিশ্ব জুরে যখন মানুষ উন্নতির সোপান তৈরী করছে, তখন আমরা পিছিয়ে যাচ্ছি। উন্নত সমাজ ব্যবস্থার কথা আমরা ভাবছি, তাই একটু একটু করে এগোচ্ছি। লোকে যতই ভুল বুঝুক, আমি প্রকৃত বংশ পরম্পরা তৈরী করছি। আজ মহিলাদের কথা কেউ চিন্তা করি না। শুধু কি তাদের ঘর হতে বার করে আনলেই হবে? চাকরী দিলেই হবে? জেনে রাখবেন, শ্রমিকের কথা চিন্তা করার আগে কারখানার কথা চিন্তা করতে হবে। তাই মহিলাদের মনুষ্যত্ব হারালে চলবে না, মানসিকতা তৈরী করতে হবে। পুরুষ এবং নারীর অধিকার পাশাপাশি চালাতে হলে দৃঢ় মানসিকতা দরকার। তাই যেমন কারখারার কথা ভাবতে হবে, তেমনি সমাজের কথাও ভাবতে হবে। সমাজ কারখানায় আমাদের সৃষ্টি। তাই আজ মিলন মেলায় সকলের আন্তরিকতা কামনা করি। নমস্কার।

সরকারের বক্তব্য শেষ হতেই সকলে হৈ-হৈ করে উঠে পড়ে। মেয়েদের মধ্যে বেশ সাড়া পড়ে যায়। রেবতীর বক্তব্যে সংস্কারের কথা আসায় সকলে অভিভূত হয়ে যায়।

পথে যেতে যেতে শিবাণী বায়েন বলে—আমরা আজ মা-বাবার বোঝা!

সতী ধীবর বলে—কথাটা খুবই দামী। যদি পুরুষ হতাম!

মেয়েদের প্রতি সমাজের ব্যবহার মেয়েরা বুঝতে পারে। যেন একটা চেতনা-ঘণ্টা বেজে ওঠে।

॥ তের ॥

জানিনা রেবতী যে তরী ছেড়েছে তা উজানে গিয়ে কোথায় লাগবে?

রেবতী চুপ করে বসে আছে দাওয়ায়। শৈল তাকে বিড়-বিড় করে কি যেন বলছে। এমন সময় শ্যাম দাসের বৌ এসে উপস্থিত হয়। বেশ লজ্জাশীলা মহিলা।

চারদিক তাকিয়ে মাথার সান খুলে বলে—তুমি নাকি বক্তৃতা দিয়েছিলে? ভাত খেতে বসে ভাসুর ওকে বলছিল।

রেবতী একটু হাসে—ঐ হল!

শৈল তাড়াতাড়ি কাছে এসে বলে—হ্যাঁ, এবার আরও কিছু করবি।

—তু চুপ কর। তোর কথা আমাকে ভাল লাগে না।

—তা ভাল লাগবে ক্যানে? কপালপুড়ী।

তারপর বৌটির দিকে তাকিয়ে বলে—দ্যাখ বৌমা, মেয়ের কাণ্ড।

বৌটি শৈলর কথায় লজ্জিত হয়ে বলে—ঘাটে আমার বাসন পড়ে আছে. আমি যাই।

শৈলও বিড় বিড় করে বকতে বকতে বাড়ীর বাইরে আসে।

শৈল বাড়ীর বাইরে আসতেই দেখে তার বাড়ীর দিকে পিওন আসছে। পিওন এসে একটা চিঠি শৈলর হাতে ধরিয়ে দেয়।

শৈল চিঠিটা পেয়ে অবাক হয়ে যায়। রেবতীর কাছে নিয়ে এসে বলে—ত্যাখ তো কে দিয়েছে?

রেবতী চিঠিটা পড়ে চুপ করে যায়। তার চোখ ছুটো স্থির হয়ে আসে।

শৈল বলে—কে লিখেছে?

—আমার সতীন।

—কি লিখেছে?

পূজনীয়া,

আজ আমরা ছুজনে বিশাল জনসমুদ্রে। তোমার প্রতি বিশ্বাস-ঘাতকতা করেছিলাম, তাই আজ আমি হতাশার গর্ভে। তবে আমিও তখন অসহায় ছিলাম, তাই জেনে-শুনেই ধরতে হয়েছিল সম্ভকে। সেজন্য ভগবান আজ চরম শাস্তি দিয়েছেন।

আমার চোখের জল শেষ হয়ে গেছে। আমি এখন সাদা কাপড়ে বিধবা। জানিনা আমার ভবিষ্যৎ। আমার যৌবন উপবনে মরুভূমির বালি ছাড়া আর কিছুই নেই। তুমি আমাকে ক্ষমা করো। তুমি আমাকে যেন অভিশাপ দিয়ো না। আমি হতভাগী, কপালপুড়ী। তা না হলে গত ১০ই ফাল্গুন আমার কপাল পুড়ত না, স্বামীকে সাপে কাটত না। তুমি হয়ত খবর পেয়েছ, তবু আমার কর্তব্য করলাম। প্রণাম নিও।

ইতি—

শুনেই শৈল কান্নায় ফেটে পড়ে। রেবতী দূরের আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে। কেউ তাকে খবর দেয় নি। শ্রাদ্ধ-কর্ম হয়ে গেছে, ছু-মাস আগেই সে বিধবা হয়েছে। তাতে তার ছুঃখ নেই, তার ছুঃখ তার সতীনের জন্য। কারণ সে-ও তো মেয়ে, তার ভবিষ্যত কি?

শৈল বলে—তা হলে উপায়?

—সরকারকাকে খবর দে।

শৈল ছোটে সরকারের কাছে। সরকার সব শুনে হু-হু করে কেঁদে ওঠে।

—সরকার মশাই, এখন উপায়?

—শাঁখা ভেঙে, সিঁদুর তুলে বিধবা।

শৈল কেঁদে ওঠে। সংসার জীবনে মা-মেয়ে একই পথের যাত্রী।

খবরটা গ্রামের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। বেশ কিছু লোকও এসে উপস্থিত হয়। নারায়ণ অঘোর সরকারের কাছে খবর পেয়ে ছুটে আসে।

এদিকে রেবতী ঘাটে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়।

নারায়ণ জিজ্ঞাসা করে—সরকারকার কাছে গেছিলি?

—হ্যাঁ।

নারায়ণ আর কোন কথা না বলে পাশে সরে দাঁড়ায়। তার অন্তরে সৃষ্টি হয় দাবানল। এই দাবানলের পাশে দেবকীর অশ্রুবন্যা উপস্থিত হয়। দেবকী রেবতীর গলা জড়িয়ে ধরে শুরু করে কান্না—আমরা দুজনে এখন একই পথের যাত্রী ..

রেবতী ঘাটে উপস্থিত হলে কটা ভাণ্ডারীর বৌ দেবকীকে সরে যেতে বলে। দেবকী সরে গিয়ে শৈলর কাছে দাঁড়ায়। তাদের পাশে সরকার দাঁড়িয়ে চোখের জল মুছতে থাকে।

রেবতীর মুখ মলিন হয়ে যায়। এক সংযমী জীবনে উপস্থিত হওয়ার জন্য সে প্রস্তুত হয়।

কিছুক্ষণ পর রেবতী শাঁখা দুটো ভেঙে হাতে ধরে ঐ দুটোর দিকে করুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। তারপর ছুড়ে জলে ফেলে দেয়। অতঃপর ভাণ্ডারীর বৌ ঘটিতে করে জল এনে সিঁদুর তুলতে থাকলে নারায়ণ আর ঠিক থাকতে পারে না। ছুটে এসে রেবতীর হাত ধরে।

শুকিয়ে যাওয়া নদীর উপর জলের স্রোত বয়ে যায়। রেবতী নারায়ণের দিকে তাকায়।

—রেবতী!

ভাণ্ডারী বৌ চীৎকার করে ওঠে—করছো কি! সব সময় তামসা ভাল লাগে না।

রেবতীর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তে থাকে। শৈল বুঝতে পারে। সরকার উন্মত্তের মতো ছুটে এসে নারায়ণকে চেপে ধরে।

ভাণ্ডারী বৌ বলে—এ অকল্যাণ।

সরকার বলে—ঠিক আছে, তোমার কাজ তুমি কর।

ভাণ্ডারী বৌ তাড়াতাড়ি সিঁদুর তুলে দিয়ে বলে—ডুব দাও।

সরকার বলে—তোমার কাজ হল?

—হ্যাঁ, হল।

রেবতী স্নান সেরে উঠতেই সরকার বলে—চল এবার আসরে। সেখানে তোদের জীবনের সেতু করে দেব।

তারপর চলে আসরের দিকে। শৈলজা সরকারকে বলে—ঠিক হচ্ছে না, সরকার মশাই।

—মন থাকলে সব হয়।

এদিকে গ্রামের অনেক লোক মজা দেখার জন্য আসরে উপস্থিত হয়। সরকার বিপ্লবকে বলে—একটা মালা নিয়ে আয় তো।

গ্রামের লোকদের মুখ থেকে ভেসে আসে—ছি-ছি, সর্বনাশ করলে, গ্রাম নষ্ট হয়ে যাবে।

বিপ্লব মালা নিয়ে আসতেই সরকার বলে—নারায়ণ, রেবতীকে মালাটা পরিয়ে দে।

মালা বদল হয়ে যাওয়ার পর সরকার বলে—সত্যই নারায়ণ-রেবতী একটা নতুন কিছু করল।

গ্রামের মানুষেরা হৈ-হৈ করতে করতে চলে যায়।

নারায়ণ-রেবতী সরকারকে প্রণাম করে।

সরকার বলে—রেবতী, তোর সমিতি চালিয়ে যাস, মা। তবে ঝাঁপা আর কুঞ্জকে যেন সঙ্গে নিস। তোর পথ হোক সুন্দর।

তারপর সরকার বলে—চল এবার কালীতলায়, সিঁদুর দান হবে। আর তোরা এখন কিছুদিন আমার বাড়ীতেই থাকবি।

তারা কালীতলার দিকে যেতে থাকলে হঠাৎ দোকানী বেরিয়ে এসে বলল—সরকার, এটোকে তো উদ্ধার করলে, ও পাড়ারটো ?

সরকার বলে—সে ব্যবস্থা হবে। পথ তৈরী করলাম। রাস্তা থাকলে যানবাহন চলবেই। দুর্গম জঙ্গল কেটে রাস্তা করা তো কঠিন, কিন্তু পথে চলা তো কঠিন নয়।

দোকানী চুপ করে যায়। সরকার শৈলকে বাড়ী যেতে বলে। তারপর রেবতী-নারায়ণকে নিয়ে চলে যায় কালীতলার দিকে।

রেবতীর চোখ জলে পূর্ণ হয়ে যায়।

॥ চোদ্দ ॥

বেলা পড়ে এসেছে। হরকালী বসে বাতা ছিলছে। দেবকী বাবার কাছে বসে আছে, আর মাঝে মাঝে বাতা সরিয়ে দিচ্ছে।

হরিতলায় কয়েকটি ফুলের গাছ জন্ম গ্রহণ করেছে। তারা হরি-গাছের দেওয়া জলেই পুষ্ট। ফুলগুলি খুব দামী নয়, যা যত্ন ছাড়াই জন্ম গ্রহণ করে ফুলের পরিচয় দিচ্ছে। মাঝে মাঝে দেবকীর দৃষ্টি যায় ঐ ফুলগুলোর দিকে।

থাকতে থাকতে দেবকী বলে—বাবা, ও পাড়ার জটা কাকা তোমাকে কি ঝাঁজুরী বুনতে বলেছিল ?

হরকালী কাজ করতে করতে মাথা নেড়ে বলে—ও আর কতক্ষণ।

এদিকে রেবতী-নারায়ণ দেবকীদের বাড়ী বেড়াতে আসার জন্য সরকারের অনুমতি প্রার্থনা করে। সরকার মঞ্জুর করে বলে—তাড়াতাড়ি ফিরিস।

রেবতী এবং নারায়ণ উপস্থিত হয় হরকালীর বাড়ীতে। হরকালী বাতা ছিলছে এবং দেবকী বাবার জন্য তামাক তৈরী করছে।

দেবকী তো ওদের দেখে অবাক হয়ে যায়। তাড়াতাড়ি চাটাই পেতে বসতে বলে।

হরকালী বলে—বাঃ, সুন্দর দেখাচ্ছে। আয় বাবা, পাশে বস।

তবে দেবকীর চোখ অশ্রুপূর্ণ হয়ে যায়। রেবতী অন্তরে অন্তরে তা বুঝতে পারে। দেবকী তাড়াতাড়ি চা করতে গেলে রেবতী তাকে হাত ধরে বসায়।

হরকালী বলে—আজকের দিনে খানিক চা না খেলে কি হয়?

নারায়ণ উত্তর করে—না মামা, আমি তো চা তেমন খাই না।

দেবকীকে একটু সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য রেবতী পুরনো দিনের কথা তুলে ধরে। দেবকী নিজেকে চেপে চেপে রাখে।

রেবতী বলে—তোর মনে আছে, প্রাইমারীতে যখন পড়তাম, তুই, মালতি, রেখা, আমি কত গল্প করতাম! ...

দেবকী হাসে। তারপর বলে—সব মনে আছে। তুই নির্মলের স্লেট ভেঙেছিলি। তোকে বৃন্দাবন মাস্টার কত মেরেছিল।

—সে আবার বলতে! চিরকাল মনে থাকবে।

রেবতী দেবকীকে চিমটি কেটে বলে—সেই মহালয়ার আগের দিনের কথা মনে পড়ে?

—ও, হ্যাঁ-হ্যাঁ, তা কি কখনো ভুলি!

বলে দুজনে হাসে। বুঝতে পারা গেল না কোন কথায় তারা হাসল।

এদিকে নারায়ণ এবং হরকালীর মধ্যে চলে গভীর আলোচনা। দেবকীর ভবিষ্যত চিন্তা করে উভয়ে। নারায়ণ বলে—বিপ্লবকে আমি বলেছি, ওকে উৎসাহিত করেছি।

—তাই?

—হ্যাঁ।

—হবে তো?

—দেখা যাক। সরকারকা তো বলেছে—হবে।

সন্ধ্যা হয়ে আসে। নারায়ণ বলে—আর বসব না।

দেবকীকে চুম্বন করে রেবতী বলে—আর বসব না, একটু কাজ আছে।

নারায়ণ এবং রেবতী উঠে দাঁড়ায়।

দেবকী বলে—রেবু, আবার আসিস, নারায়ণদা এসো।

হরকালীও তাদের আবার আসতে বলে।

নারায়ণ এবং রেবতী চলে গেলে দেবকীর দেহের জল বাষ্প হয়ে বেরিয়ে আসে। তার মন একবার দূরের আম গাছের দিকে যায়, আবার পাশ দিয়ে বেয়ে যাওয়া কাঁদরের মধ্যে।...

দেবকী চুপ করে বসে থাকে গালে হাত দিয়ে। হরিতলার ছোট ছোট ফুলগুলি তার দৃষ্টি কেড়ে নেয়। চোখের জল গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ে।

হরকালী বলে—মা, সাঁজ দে। সাঁজ জি বাঁউরে যেছে।

দেবকী নিজেকে একটু সামলে নিয়ে সন্ধ্যা জ্বালে। তারপর প্রদীপের সামনে চুপ করে বসে। মিট মিট করে প্রদীপ জ্বলে, দেবকী তাকিয়ে থাকে সেই দিকে।

এদিকে হরকালী প্রতিদিনের অভ্যাস মতো হ্যারিকেনের পিছনটা দিয়ে তৈরী একতারাটা নিয়ে বসে গান ধরে—

সারা দিনের শেষে এল আঁধার—
জীবন হল শেষ, পালা এল কাঁদার।
মনের সকল হরষ গেল চলে—
থাকবে না কেউ সময় শেষ হলে।...

দেবকীর কান্না থামে না। প্রদীপের সামনে বসে কেঁদে চলে।

হরকালীর গান শেষ হতেই শোনে দেবকীর কান্না। হরকালী কান্নার সুরে বলে—চুপ কর মা, চুপ কর।

কিন্তু দেবকীর ব্যথা উথলে ওঠে। রেবতী-নারায়ণের ছবি ভেসে ওঠে তার মনে। অশ্রুপূর্ণ নয়নে পিতার আঁচলে মুখ গুঁজে বলে— বাবা— বাবা গো........

দেবকীর চোখের জলের বন্যায় হরকালী এবং দেবকী ভাসতে থাকে।
